২৪৮

সাক্ষরতা বুলেটিন

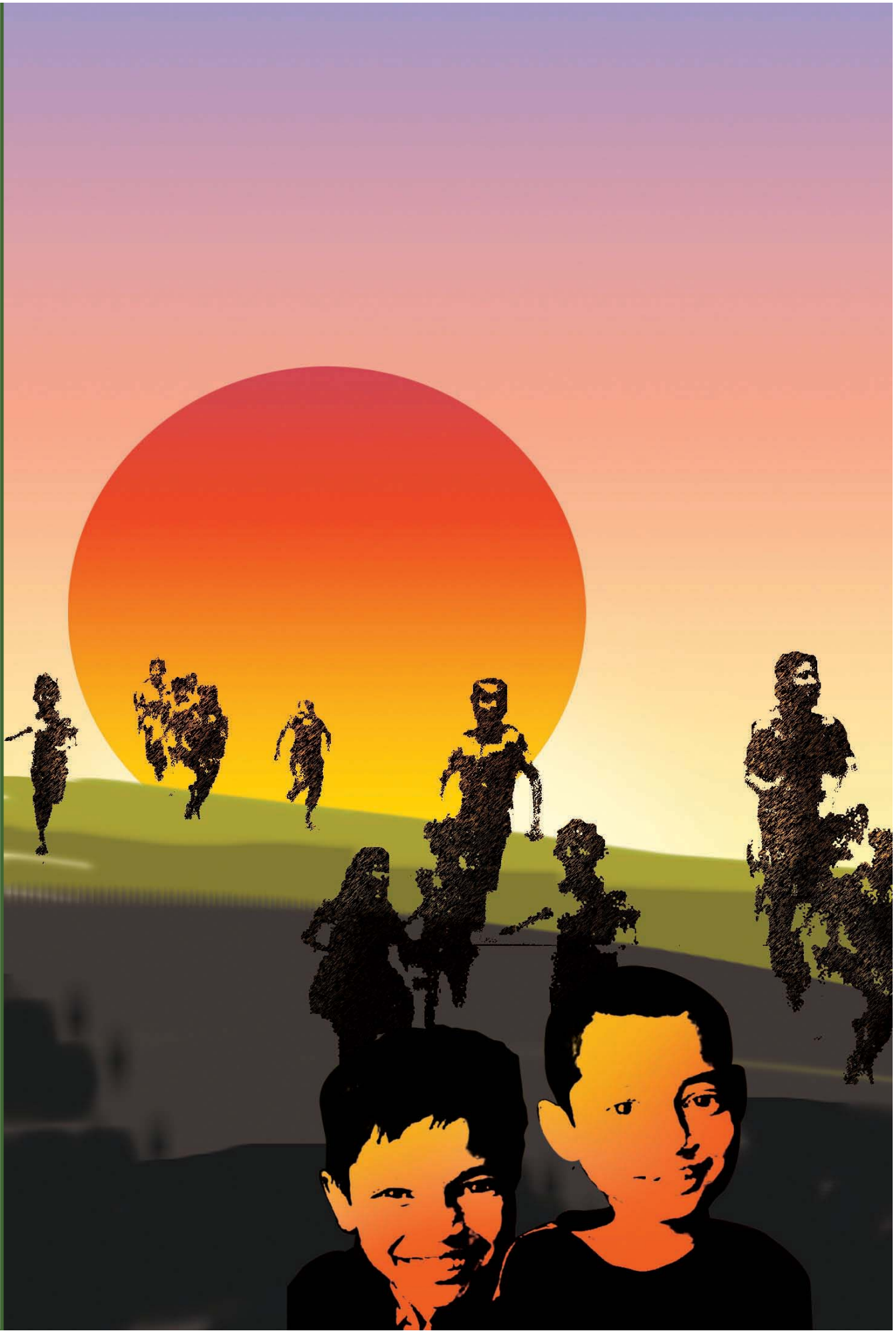

মাঘ ১৪২১
জানুয়ারি ২০১৫

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪৮ মাঘ ১৪২১ জানুয়ারি ২০১৫

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সূ চি প ত্র

৩ **মাহমুদুল হক**
মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে বড় অন্তরায় শিক্ষা বাণিজ্য

৭ **শফি আহমেদ**
শিক্ষা ও রাজনীতি

১০ **মুহম্মদ হাসান খালেদ**
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা

১৩ **এনামুল হক খান তাপস**
স্বপ্ন ভাঙ্গার গল্প
উন্মুক্ত শিক্ষার একটি ভুলুণ্ঠিত উদ্যোগ

১৭ **শর্বরী আলোময়ী**
পৌষের আহ্বান

২১ **ফারদানা আলম সোমা**
দাহ-যাতনা ও তার প্রতিকার

২৩ **বিশেষ প্রতিবেদন**
মালয়েশিয়ায় শিক্ষা সফর

২৬ **তথ্যকণিকা**

২৮ **সংবাদ**

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

মাহমুদুল হক

মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে বড় অন্তরায় শিক্ষা বাণিজ্য

আমাদের দেশের ৪০%-এর বেশি নারী-পুরুষ এখনো নিরক্ষর। বাকী ৬০%-এর একটি অংশ নব্য সাক্ষর। নিরক্ষর আর নব্য সাক্ষর মানুষগুলোর কাছে যদি বর্তমান মানসম্পন্ন শিক্ষা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তাহলে তাদের বেশির ভাগই সঠিক উত্তরটা দিতে পারবেন না। তারা সোজাসাপটা একটি কথাই ভাল জানেন, তা হলো ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দিবে, তার জন্য প্রাইভেট পড়তে হবে বা কোচিং করাতে হবে। ছেলে স্কুলে/কলেজে ভর্তি হবে তার জন্য এত টাকা লাগবে, কোচিং করাতে হবে। ছেলে-মেয়ে জিপিএ পাঁচ পেয়ে পাশ করেছে। তার মধ্যে শিক্ষার কি গুণগত মান আছে আর নাই, তা তাদের কাছে মুখ্য বিষয় নয়। ছেলে বলেছে প্রাইভেট পড়তে হবে টাকা লাগবে, কোচিং করতে হবে টাকা লাগবে। বাবা-মা চোখ বন্ধ করে টাকা দিয়েছেন। তারা এটাই মনে করে পাশ করতে হলে প্রাইভেট পড়তে হবে কোচিং করতে হবে। এটাই এখন নিয়ম। যখন বেশির ভাগ মানুষ প্রস্তাবিত নিয়মকে সমর্থন দেয় তখনই সেটা নিয়মে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হলো আমাদের দেশে প্রাইভেট কোচিং শিক্ষার অবৈধ একটি বিষয়। (যা ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষার প্রসারকে সংকুচিত করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে মানসম্মত শিক্ষা প্রাপ্তি থেকে শিক্ষার্থীদেরকে বঞ্চিত করে, সবার জন্য শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষা বিত্তবানদের জন্য কেনার বস্তুতে পরিণত করে, সর্বোপরি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মানসম্মত শিক্ষার যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে না। সে অশনিসংকেত আমরা পেতে শুরু করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় একটি ডিপার্টমেন্টে মাত্র দুইজন শিক্ষার্থীর পাশ করার মধ্য দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত যে, এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের ভিত্তিতে নয় ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে)।

এই অবৈধ বিষয়টি আজ বৈধতায় রূপ নিয়েছে। এটা এখন অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। দেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছে এই পেশাটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে ফলে এই অবৈধ নিয়মটি এখন সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমি এ পেশার নাম দিয়েছি বিকল্প স্কুল/কলেজ। দেশে কি পরিমাণ কোচিং সেন্টার রয়েছে আর কতজন শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান তার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে না। তবে এক কথায় বলা যাবে, একজন শিক্ষার্থীর এসএসসি পাশ করার জন্য তার স্কুলের বেতন, বই, খাতা কলম ইত্যাদির জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয় তার চাইতে কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ গুণ টাকা এলাকা ভেদে বেশি খরচ করতে হয় প্রাইভেট কোচিং-এ। একটি স্কুলের অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী প্রাইভেট কোচিং-এ পড়ে। তাহলে কোচিং সেন্টারকে বিকল্প স্কুল/কলেজ বলা কেন অযৌক্তিক হবে। বাকী শুধু কোচিং সেন্টার থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও ফরম ফিলাপের রেজিস্ট্রেশন। ২০১৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় কোচিং নির্ভরতায় পিছিয়ে পড়ছে দিনাজপুরের শিক্ষার্থীরা।

প্রশ্নপত্র ফাঁস অবৈধ প্রাইভেট-কোচিং বাণিজ্যের একটি ফসল
অনলাইনে যখন পিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হলো তখন সে প্রশ্ন হাতে পেয়ে অনেক কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট মাষ্টাররা রাত ১০টায় শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারে নিয়ে আসেন পাশাপাশি অনেক স্কুলে সকাল ৭টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের উত্তর রিভাইজ করানো হয়। পুরো একটি বছর পিএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে কোমলমতি এই শিশুরা। এক বছরের প্রস্তুতি থেকে তাদেরকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের উত্তর রিভাইজ/মুখস্থ করানো হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া একজন শিশু কি এত বেশি মানসিক ভার নেওয়ার ক্ষমতা রাখে? রাখে না। পত্রিকায় এসেছে প্রাথমিকে ৭৫% শিক্ষার্থী ভালোভাবে শিখছে না। প্রাইভেট কোচিং বাণিজ্য আজ শিক্ষার্থী- অভিভাবক এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হয়ে গেছে। তারা শিক্ষার্থীদের নগদ চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। তাদের দেওয়া সাজেশন পড়লে পরীক্ষার বেশির ভাগ প্রশ্ন কমন পড়ে। যে শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান সে শিক্ষক স্কুলের প্রশ্ন তৈরির কাজে সম্পৃক্ত থাকেন, সুতরাং প্রশ্নতো কমন পড়বেই। বাকী থাকে পিএসসি/জেএসসি/এসএসসির প্রশ্ন হাতে পাওয়া। তাও ম্যানেজ করা হয়েছে প্রশ্ন পত্র ফাঁসের মাধ্যমে। কোচিং প্রাইভেট বন্ধ না হলে এ দেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী শুধু জিপিএ-৫ ই পাবে, কিন্তু তারা সমাজ রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না। প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হবে মানসম্মত শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাপারে সরকারকে বেশি কঠোর হতে হবে এবং অভিভাবকদের মধ্যে কোচিং/প্রাইভেট বিরোধী মনোভাব তৈরি করতে হবে।

অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক আছেন যারা তাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। প্রাইভেট কোচিং সেন্টার যেভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার সাথে যুদ্ধ করে কিভাবে তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করবেন। সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকরা শুধু কোচিং প্রাইভেট নিয়ে দুশ্চিন্তায়ই নেই, ভর্তি নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছেন। সরকারি স্কুল/কলেজগুলোতে ভর্তি করতে শ্রেণিভেদে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন দিতে হয়। অনেক মেধাবী গরিব শিক্ষার্থীর অভিভাবকের পক্ষে এত বড় অংকের ডোনেশন দিয়ে সরকারি ও নামী-দামি স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হয় না। সরকারি বেসরকারি সব স্কুলে ভর্তি ফি এক হওয়া প্রয়োজন।

কেমন কোচিং চাই: পরীক্ষায় ভাল ফলাফল শিক্ষার্থীর অর্জন, বিদ্যালয়ের সুনাম আর শিক্ষকদের জন্য সম্মান। শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয় বড় বড় বন্ধের দিনগুলোতে। দেশের বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ঐ স্কুলের শিক্ষার্থীরাও কোচিং ক্লাশ করেছে। তবে টাকা দিয়ে নয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বন্ধের দিনগুলোতে এবং অন্যান্য সময়ে রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট কোচিং করাতেন। শিক্ষকরা ছুটি ভোগ না করে নিজেদের সম্মান বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে বিনা পয়সায় কোচিং করাতেন। অন্য একটি প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে ঐ স্কুলের ৫ম শ্রেণিতে পড়ালেখা করতো এবং প্রধান শিক্ষকের কাছে কোচিং করতো। মাস শেষে ছেলের বাবা কোচিং-এর ফি বাবদ ৩০০ (তিনশত) টাকা ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজিজ স্যার টাকাটা রেখে ওই ছেলেকে বললেন, তোমার বাবাকে আমার সাথে দেখা করতে বলবে। ছেলের বাবা দেখা করার পর আজিজ স্যার ৩০০ টাকা ফেরত দিয়ে বললেন, এই স্কুলে কোচিং-এর ফি বাবদ কোন টাকা নেওয়া হয় না। টাকা ফেরত পাওয়ার পর ছেলের অভিভাবক আবেগপ্রবণ হয়ে আজিজ স্যারকে বললেন স্যার আমিসহ অনেকেই ধারণা করতাম, আপনি কোচিং-এর নামে কোচিং বাণিজ্য করছেন। আজ আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। প্রধান শিক্ষক হিসেবে আজিজ স্যারের ৩৫ বছরের নেতৃত্বের ফল ১৯৯৫ সালে ঐ স্কুলটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রাইমারী স্কুলের স্বীকৃতিঅর্জন করেছে। আজিজ স্যার প্রাইভেট কোচিং থেকে টাকা না নিয়ে এখন হয়তো অসচ্ছলতার মধ্যে আছেন কিন্তু তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ে কারো প্রশ্ন তোলার সুযোগ ছিল না।

প্রাইভেট কোচিং-এর বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ: গত ২০ জুন ২০১২ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২ নামে একটি নীতিমালা প্রকাশ করেছে, যার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর) মাদ্‌রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল) ও কারিগরি বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবত এক শ্রেণির শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং পরিচালনা করে আসছেন। এটি বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন যা পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ সম্পর্কিত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৩৬৬/২০১১-এর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর কোচিং বাণিজ্য বন্ধে একটি গেজেট নোটিফিকেশন বা অন্য কোনরূপ আদেশ প্রদানের নির্দেশনা

রয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি ও হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকার কর্তৃক এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

কোচিং: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকের নির্ধারিত ক্লাসের বাইরে বা এর পূর্বে অথবা পরে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে/বাইরে কোন স্থানে পাঠদান করাকে কোচিং বোঝাবে।

কোচিং বাণিজ্য: উপানুচ্ছেদ (চ) অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয়/দৈনিক/স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, দেয়াল লিখন অথবা অন্য কোন প্রচারণার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বোঝাবে।

প্রাইভেট টিউশনি: প্রাইভেট টিউশনি বলতে শিক্ষকের নিজ গৃহে কিংবা শিক্ষার্থীর গৃহে পাঠদান বুঝাবে।

শাস্তি: শাস্তি বলতে কর্মরত শিক্ষকগণের কোচিং বাণিজ্যে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণসাপেক্ষে অনুচ্ছেদ ১৩-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাকে বোঝাবে।

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম চলাকালীন শ্রেণি সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেন না। তবে-

ক. আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে শুধুমাত্র অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান-প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

খ. এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০/- (তিনশত) টাকা, জেলা শহরে ২০০/- (দুইশত) টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা রশিদের মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ক্লাস পরিচালনার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফি আকারে গ্রহণ করা যাবে যা সর্বোচ্চ ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকার অধিক হবে না। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান-প্রধান স্ব-বিবেচনায় এ হার কমাতে/মওকুফ করতে পারবেন। একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২টি (বার) ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

গ. এই নীতিমালার আওতায় সংগৃহীত ফি প্রতিষ্ঠান-প্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা তহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুত, গ্যাস এবং সহায়ক কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ ১০% অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ অতিরিক্ত ক্লাসের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে অতিরিক্ত সময় ক্লাস পরিচালনার অন্যান্য খরচ উল্লিখিত অর্থের বাহিরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে আদায় করা যাবে না। এছাড়া কোন ক্রমেই উক্ত খাতের অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

২. কোন শিক্ষক তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-প্রধানের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে দৈনিক বা প্রতিদিন অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমিত সংখ্যক ১০ (দশ) জনের বেশী নয় শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা (রোল, শ্রেণি উল্লেখসহ) জানাতে হবে।

৩. কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবেন না বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না বা কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারবেন না।

৪. কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং-এ উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতে পারবেন না। এমনকি কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

৫. কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং-এ আসার জন্য তার নিজ নামে বা কোচিং সেন্টারের নামে কোন রকম প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি কোচিং বাণিজ্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-প্রধান প্রয়োজনীয় প্রচারণা এবং অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করবেন।

৮. কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না।

৯. কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

১০. মনিটরিং: কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হল:

মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় পর্যায়ে নয় সদস্য বিশিষ্ট, জেলার ক্ষেত্রে আট সদস্য বিশিষ্ট এবং উপজেলা পর্যায়ে আট সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করার নির্দেশনা রয়েছে।

১১. কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালার প্রয়োগ এবং এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১২. শাস্তি:

ক. এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর এমপিও স্থগিত, বাতিল, বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন।

খ. এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও-বিহীন কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ. এমপিও-বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঘ. কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত শিক্ষক-এর বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সরকার পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেয়াসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমতি, স্বীকৃতি, অধিভুক্তি বাতিল করতে পারবে।

ঙ. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক কোচিং এ জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮-এর অধীনে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রাইভেট কোচিং-এর নীতিমালা ২০১২ কোনো প্রাইভেট/কোচিং-এর ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান মেনে চলার সংবাদ চোখে পড়েনি। আর এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোন ফলোআপও মনিটরিং হচ্ছে না। প্রাইভেট-কোচিং বন্ধ করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। শিক্ষার্থীদেরকে সমাজের জন্য উপযুক্ত মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হলে প্রথমেই প্রাইভেট-কোচিং বন্ধ করতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে মানসম্মত শিক্ষা পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের ভেতর ও বাহির থেকে অনেক বাধা আসতে পারে, সে বাধাকে উপেক্ষা করেই সরকারকে প্রাইভেট-কোচিং বন্ধে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এ বিষয়টিকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করতে হবে, যাতে কেউ প্রাইভেট-কোচিং-এর পক্ষে কথা বলার সুযোগ না পায়। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক পদক্ষেপ পূর্বে লক্ষ্য করেছি। যেমনটি দেখেছি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধের বিষয়ে। যখনই দু-একটি অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তখনই কোনো না কোন প্রভাব খাটিয়ে সে উদ্যোগকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছে তখন কেউ সে উদ্যোগ থামাতে পারেননি। যার ফসল বেশির ভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধ হয়েছে।

স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে অবৈধ প্রাইভেট-কোচিং এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে। সাথে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ থাকতে হবে।

প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অবৈধ প্রাইভেট-কোচিং-এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করে পরীক্ষায় পাশ করবে এবং সে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকরা সারা জীবনের সম্মান তৈরির জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবেন।

মাহমুদুল হক
শিক্ষা উন্নয়নকর্মী

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ ফি আ হ মে দ

শিক্ষা ও রাজনীতি

এখন হয়ত সে ধরনের রচনা শিক্ষা বইয়ের প্রচলন নেই। কিন্তু আমরা যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন এমন একটা স্বল্পকলেবর রচনা আমাদের পাঠ্যবইয়ের অন্তর্গত থাকত, যার সাধারণ শিরোনাম ছিল 'ছাত্র ও রাজনীতি'। ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কি না, তা নিয়ে কিছু যুক্তিনির্ভর কথা অমন রচনার বিষয় ছিল। আমাদের ছাত্রাবস্থায় আর একটি অতি পুরোনো অনাদি কথা শুনতাম আমরা। ছাত্রানাং অধ্যয়ন তপঃ। সংস্কৃত ভাষার এই প্রবাদটির অর্থ ছিল, পড়াশোনা করাই ছাত্রদের তপস্যা হওয়া উচিত অর্থাৎ এর বাইরের কোন কাজের বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংশ্রব থাকা উচিত নয়। যাক সেসব কথা। পৃথিবী অথবা সমাজটা তো আর সেদিনের মত নেই। বিশেষ করে যদি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতের কথা চিন্তা করি, একথা তো কোনভাবে অস্বীকার করা যাবে না যে, সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের একটা অসাধারণ গৌবরময় ঐতিহ্যের কথা আমরা সবসময় সগর্বে স্মরণ করে থাকি। তার পরের ইতিহাসের কথা আর উল্লেখ করতে চাইছি না।

আমার এই বর্তমান নিবন্ধের বিষয় অবশ্য ছাত্র রাজনীতি নয়। যদিও টেণ্ডারবাজি, সহিংসতা ও চাঁদাবাজির নানা সমস্যা এখন এমন প্রকট হয়ে উঠেছে যে, ছাত্রদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করার একটা দাবি নানা মহল থেকে বেশ জোরালো কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। ঠিক এই স্পর্শযোগ্য বর্তমানে, মানে বিগত মাসখানেক ধরে দেশে এক বিচিত্র অথচ তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘনঘটা শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বিভিন্ন রকমের প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের সুবাদে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের হালচাল এখন অনেক ভালো। একথা সবাই মানেন। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর পরিকল্পিত নেতৃত্বে এখন প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশব্যাপী পাবলিক পরীক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। এই পরীক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কেউ কেউ যদিও সমালোচনার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, কিন্তু অভিভাবক জনসাধারণ এর মধ্যে বেশ আনন্দ এবং সাফল্যের অর্থ খুঁজে পান। অমন একটা একাডেমিক বিতর্কের মধ্যে আপাতত আমাদের জড়ানোর দরকার নেই।

কিন্তু যে বিষয়টা আমাদের আবশ্যিক মনোযোগ দাবি করে তা হল, শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে সচল রাখা। নানা অযাচিত কারণে আমরা এমন একটা সংবাদের সঙ্গে নির্বিবাদে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, অমুক বিশ্ববিদ্যালয় বা তমুক কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে; শিক্ষার্থীদের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে যার মধ্যে তাদের হল বা আবাস ছেড়ে যেতে হবে। কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন অনির্ধারিত বন্ধের পর খুলে দেয়া হল, কিন্তু আবার এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হল যে, পুনরায় কর্তৃপক্ষ শিক্ষাদান বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

এই অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য যেন স্বাভাবিকতা অর্জন করেছে। এটা নিয়ে আমরা আর প্রশ্ন তুলছি না। হরতাল অবরোধের কারণে কি ধরনের কতটা ক্ষতি হল, সে বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ক্ষয়ক্ষতির নানা বিবরণী পেশ করে থাকে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার তাৎক্ষণিকভাবে কতটা ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য পাঠদান বা পরীক্ষা নেবার যে বিকল্প বা সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়,

তার ফলে শিক্ষা নামক দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কতটা ঘাটতি বা ফাঁকি থেকে যায় এবং এই বাধ্যতামূলক ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে সারা দেশ বা জাতির ভবিষতের জন্য কতটা ক্ষতিকর বা নেতিবাচক সে সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন পরিমাপযোগ্য হিসেব নিকেশ দেয় না, শিক্ষক সংগঠনসমূহ, যারা প্রায়শই নিজেদের আর্থিক দেনদরবার বিষয়ে বেশ মুখর, কখনও বা শহীদ মিনারের পাদদেশে অনশনরত, তারাও কোন উচ্চবাচ্য করে না; কোন আন্তরিক উদ্বেগের কথা শোনা যায় না বিপুলসংখ্যক শিক্ষক জনগোষ্ঠীর মুখে।

আমি তো পেশাগত কারণেই অনেক সহকর্মীকে চিনি যারা এমন অনির্দিষ্ট কালের 'বন্ধ' থাকার সময়টাকে Welcome Vacation হিসেবে উপভোগ করেন। মনে পড়ে, এরশাদের আমলে দীর্ঘকাল দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি আদেশে বন্ধ রাখা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা এটার নাম দিয়েছিল এরশাদ ভেকেশন। কিন্তু সরকারি আদেশেই হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সমাজের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। আমরা যখন শিক্ষা অর্জনের মান সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলি, আমরা যখন প্রত্যাশিত মাত্রার দক্ষ মানব সম্পদের অভাব সম্পর্কে কথা বলি, তখনো কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতি ততটা মনোযোগ দিই না। শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাকে বড় করে দেখি, শিক্ষকদের কর্মে অবহেলার কথা বলে থাকি (সেটা অবশ্য অসত্য কিছু নয়)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণ আমরা সবাই জানি। অদ্বিতীয় কারণ না থাকলেও এটা বোঝা যায় যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ওইসব কারণের মূলটা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে দেখা যায়, প্রতিপক্ষ বা একই পক্ষের দুই উপদলের মতবিরোধ অথবা কর্তৃত্ব স্থাপনের দুর্দমনীয় প্রয়াস। নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি কারণে মারামারি হানাহানি চলছে, মৃত্যুর ঘটনাও নেহাত দুর্লভ নয়। কর্তৃপক্ষের একটা ব্যবহারিক কর্মপদ্ধতি আছে, আরো সহিংসতার আশঙ্কায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হল। আবশ্যিকভাবেই রাজনীতি, রাজনৈতিক আনুগত্য, রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদিতা, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে অনৈতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করে অর্থ আদায়, কোন বিশেষ পদে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়োগদানের জন্য চাপ সৃষ্টি ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীদের অযাচিত ও অগ্রহণযোগ্য ভূমিকা,– এই সবের নেপথ্যেই আছে রাজনীতি।

বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় বছর খানেক বন্ধ ছিল। ছাত্রদের রাজনীতির ভূমিকা সেখানে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ধর্মঘট করতে লাগলেন, কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করলেন, শ্রেণীকক্ষের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন, প্রশাসনিক ভবনের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিলেন, ভেতরে অনেকে আটকা পড়ে গেলেন, কয়েক ঘণ্টার জন্য নয়, কয়েকদিনব্যাপী ভবনের মধ্যে আটকে পড়া ব্যক্তিদের কেউ কেউ ডায়াবেটিস ব্যাধিগ্রস্ত; উপাচার্যের জন্য পাঠানো খাদ্য যাতে ভেতরে না যেতে পারে তেমন নিষ্ঠুর অশোভন ব্যবস্থাও নেয়া হল।

আবার অমন শিক্ষা অচল করে দেয়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ নিজেরাও তাদের দাবি আদায়ে অনশন ব্রত পালন করতে লাগলেন। এই কাহিনী দেশের সব সংবাদপত্রে বা টেলিভিশন চ্যানেলে সবাই দেখেছেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সবাই, তাদের অসহায় নির্বিকার অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য দেশের রাষ্ট্রপতি, সবাই। প্রায় এক বছর বন্ধ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। আন্দোলনরত শিক্ষকদের বেশির ভাগই ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন কি দেশের জন্য নানা গৌরব বহন করে এনেছেন, তাঁরাও যে তাঁদের আন্দোলনের দাবি আদায়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দেশের জন্য অপূরণীয় (গুণগত, পরিমাণগত এবং আক্ষরিক সকল অর্থেই) ক্ষতি সাধন করছেন, সে বিষয়ে নিতান্তই উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন।

বিশেষভাবে এখানে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কথা বলছি, সেখানে উপাচার্য পদে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মেনে না নেয়ার জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ও বিস্তার লাভ করেছিল। খোলা চোখে মনে হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক শিক্ষক, যাঁরা জ্ঞানে গুণে বিতর্কাতীতভাবে অগ্রবর্তী, তাঁরা যে দাবি আদায় করতে চাইছেন তা তো উচিত বলেই গণ্য। কিন্তু আবার এটাও তো দেখা যাচ্ছে যে, আরো বেশ কিছু শিক্ষক রয়েছেন, যাঁদের সিদ্ধান্ত ও প্রজ্ঞায় আমাদের আস্থা প্রদর্শনের যথেষ্ট কারণ রয়েছে, তাঁরা তো ভিন্ন মতাবলম্বী, তাঁরা তাঁদের অন্য সহকর্মীদের এমন শিক্ষা শৃঙ্খলাবিনাশী কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করছেন না।

বিবাদমান এমন দুই শিক্ষক গোষ্ঠীর মধ্যে কোন অংশ সঠিক, কতটা সঠিক, সেসব কূটপ্রশ্ন আমরা এক পাশে সরিয়ে রাখতে পারি। যেভাবেই দেখি না কেন, এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির নেপথ্যে যে কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল রাজনৈতিক। দেখা গেছে, ওই বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন আন্দোলন কৌশলে জাতীয় পর্যায়ে সাপে নেউলে সম্পর্কের লক্ষণজাত দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকবৃন্দের মধ্যে প্রকাশ্য/ অপ্রকাশ্য আঁতাত বেশ কার্যকর ছিল। যতই এর অনৈতিক দিকটার কথা বলি না কেন, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোন পথই পরিহার্য নয়। এই দৃষ্টান্ত খুব সুলভ না হলেও, যে কথাটি জোর দিয়ে বলতে চাইছি তা হল, শিক্ষাব্যবস্থার নানা ধরনের মাৎস্যনায়ের মূল কারণটা রাজনৈতিক।

একথা সবারই পরিজ্ঞাত যে, রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে ক্ষমতার যোগ থাকে। ক্ষমতা প্রদর্শন অথবা প্রয়োগের সঙ্গে এক ধরনের আধিপত্যের সম্পর্ক আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা অথবা এই ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা বা উপেক্ষার উদাহরণ দেবার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে কষ্টকর ও অনভিপ্রেত কাহিনীর উহ্য অবতারণা করলাম, তারও দরকার পড়ে না। মাস ছয়েকেরও কম সময়ে সংবাদপত্রে এমন একটা খবর পড়েছি যে, কোন এক সংসদ সদস্যের জন্মদিবস পালনের জন্য স্কুলের ক্লাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, শিক্ষার্থীদের সবাইকে স্কুলে দীর্ঘতর সময় থাকতে বাধ্য করা হয়েছে এমনকি তাদের কাছ থেকে কিছু চাঁদাও আদায় করা হয়েছে ওই অনুষ্ঠানের জন্য। কী রকমের সব শিশুদরদী শিক্ষাদরদী সাংসদ আমাদের! সাংসদ অথবা মন্ত্রীদের সম্বর্ধনার জন্য তীব্র রোদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের দাঁড় করিয়ে রাখা, ক্লাস বাতিল করা, অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য শিক্ষকদের নিয়োজিত করা ইত্যাদির সংবাদ হরহামেশাই খবরের কাগজে ছাপা হয়। যেভাবেই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হোক না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়া এসব ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক কারণটিই প্রধান। কিন্তু শিক্ষার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে যেন কারো মাথাব্যথা নেই।

অতি সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে দেশব্যাপী যে বিচিত্র রকমের বিশৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাই, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে নানামুখী উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকের কথা খুব উঁচু গলায় না হলেও বলা হচ্ছে, ব্যবসায়ী সংগঠনের সামর্থ্য নানা দিক থেকেই অনেক বেশি, তাদেরকে প্রায় প্রত্যেক দিনই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই তাঁদের নিজেদের সামর্থ্যের গুণে। মাঝরাত কাঁপিয়ে দেশের ত্রিশটিরও অধিক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে তর্কবিতর্কের ঝড় তোলা কথা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে প্রতিরাতেই যা আলোচনার মিছিলের অগ্রভাগে থাকে তা হলো রাজনীতির সুতীব্র কথকতা।

বিগত দু'মাসে দেশে যে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে তা নিয়ে যে যে যার মত তুখোড় কথাশক্তির যুদ্ধে মেতে উঠবেন, সে বিষয়ে আমার মত অভাজনের আপত্তি তোলা নেহাতই অনধিকার চর্চা, কিন্তু এই দু'মাসে শিক্ষাব্যবস্থায় যে চরম অনাচার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে পায়রার মৃদু স্বরে বাকবাকম করতেও দেখা যায়নি মধ্যরাতের এমন দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ বাকশিল্পীদের। তা হলে কি ধরে নেব, বাল্যকালে লেখা 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' বলে যে প্রবাদবচনটাকে আধুনিক কাল প্রায় সবৈবভাকে বাতিল করে দিয়েছে, ঠিক তারই সমান্তরালে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' বলে যে প্রবচনটা এখনো প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রায় সকলেই উচ্চারণ করে থাকেন, সেটাও তার সারমর্ম হারিয়ে ফেলেছে? পেশীশক্তির নির্বিচার কিন্তু ফলপ্রদায়ী প্রয়োগে কি মেরুদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে?

২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের দেশের রাজনীতির উত্তাপ বাড়তে বাড়তে গনগনে আগুন হয়ে ওঠে। দুই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক জোটের মধ্যে ভাল লড়াই হওয়াটা আমাদের জন্য উপভোগ্য হতে পারত। কিন্তু আমরা যা দেখলাম তা মারামারি, খুনোখুনি এবং অমানবিক সহিংসতা। আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যা। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রয়োগে দেশের বিদ্যালয়সমূহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাতেও লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষকদের অনেককেই শিক্ষা-নিরপেক্ষ অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

কিন্তু রাজনৈতিক আক্রোশে দেশের প্রায় পাঁচশত বিদ্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা আর কোন দেশ বা সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে কিনা, সেজন্য ইতিহাসের পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। টেলিভিশনের পর্দায় ওই ছবি দেখে আমরা শিহরিত হয়ে উঠেছি। রাজনীতিক ও তাঁদের অনুসারীদের যদি জিজ্ঞেস করি যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদের যদি যৎসামান্য তাৎক্ষণিক মুনাফাও জোটে, কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র দেশে স্কুল ভাঙার ক্ষতি কি তার সঙ্গে তুল্য? তাঁরা কি উত্তর দেবেন, আমার জানা নেই। দেশের ভবিষৎ নাগরিকদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলবার কোন দায়িত্ব কি তাদের ওপর বর্তায় না?

শিক্ষা ও প্রগতি নিয়ে ভাবেন এমন কয়েকজন বিবৃতি দিয়ে আকুল আবেদন জানালেও রাজনীতির আগুন থেকে শিক্ষালয়গুলিকে রক্ষা করা যায়নি। এধরনের অন্য একটি বিবৃতি এই কিছুকাল আগেও আমরা দেখেছি। দেশে এখন অনেকগুলি পাবলিক পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে। এইমাত্র দু'দশক আগের রাজনৈতিক কর্মসূচি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, শিক্ষার্থীদের এমন পরীক্ষার সময়কালে, শুধু নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নয়, কোন রকম হরতাল ডাকা হত না। কিন্তু এখন রাজনৈতিক দলের নেতারা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করছেন না। শিশুদের জীবন, শিক্ষা-জীবন এবং ভবিষ্যৎ তাঁরা বিবেচনার মধ্যে আনছেন না।

আবার বলতে হয়, পরীক্ষা পেছানো মানে দিন পরিবর্তন নয়, একটা প্রজন্মের মনস্তত্ত্বের ওপর বিশাল চাপ পড়া। শৈশবে ও কৈশোরে এই চাপ নেবার মত অবস্থা তাদের থাকে না। এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। কিন্তু রাজনীতিকরা এমন বিবেচনাকে বালখিল্য মনে করেন। তাদের হরতালের আহবান দিন, সপ্তাহ পেরিয়ে যায়। শিক্ষাকে যে তাঁরা কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না, এর ফলে শুধু কয়েক লক্ষ শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, অনাগত কালে বাংলাদেশের আকাশে কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ হাসান খালেদ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা

মানব সমাজের ইতিহাসে কবে কখন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রথম উন্মেষ ঘটে তা বলা কঠিন। তবে বর্তমান বিশ্বে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর উদ্ভব ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটতে শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুই ধারার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রবর্তনের জন্য শুরু হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold War)। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পরিচর্যা এবং ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোই এই ঠাণ্ডা যুদ্ধে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। কর্তৃত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে এক ধরনের পরনির্ভরশীল বা দাতা নির্ভরশীলতার বীজ বপন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। বাজার ব্যবস্থা হয়ে উঠে অস্থিতিশীল। মানুষের মৌলিক চাহিদা বিপন্ন হতে বসেছিল। সেসময় অনুন্নত দেশগুলোতে এক ধরনের গণবিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এই গণবিস্ফোরণোন্মুখ পরিণতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভাব্য গণবিস্ফোরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে সরকার ও আমলাদের সহযোগিতায় এবং রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কার্যক্রমের আওতায় অঢেল অর্থ ঢালতে শুরু করে।

অতি কৌশলী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কয়েক বৎসর পর বুঝতে পারল তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের মনে ক্ষোভের দানা বাঁধছে। সে সময়ই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো নতুন পুঁজিবাদী কৌশল ও প্রকল্প হাতে নিল। তারা দুর্বল এবং সবল সকল রাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। নিজেদের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার অঙ্গীকার করা হল। কিন্তু বাস্তবে পর্দার অন্তরালে থেকে গেল প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অনুদান এবং নির্দেশনা। ফলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর সরাসরি অনুদানের মাত্রা দেশে দেশে হ্রাস পেলেও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ছত্রছায়াতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ঔপনিবেশিক এবং অনুন্নত দেশগুলোকে বিদেশী সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং পরনির্ভরশীল করে রাখার দুরভিসন্ধি কাজে লাগাতে লাগলো।

দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অদূরদর্শী রাজনৈতিক কাঠামোজনিত কারণে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ নানানভাবে অপচয়ের পরেও যেটুকু অর্থ অনুন্নত দেশের দরিদ্র মানুষের নিকট পৌঁছায় তার দ্বারাও ঔপনিবেশিক প্রভু রাষ্ট্রগুলো দেশে দেশে গণবিস্ফোরণ রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্বে সেসময় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রগতিবাদী আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল। কিন্তু ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং নীতি নির্ধারণে অতিমাত্রায় কঠোরতা সুষম সম্পদ বণ্টনে অঙ্গীকারাবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো তখন বেশির ভাগ দেশকেই আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্লেষকগণ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো যে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে তারা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে দেশে বিলিয়ে দিচ্ছে, তার এক বৃহদাংশ তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা কখনও কখনও তাদের অগোচরে লুটপাট হয়ে যাচ্ছে। তাদের অর্থ প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলোর মাঝে ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না। এছাড়াও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি দেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখার যেসব ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল, তাও বিভিন্ন দেশের জনগণের মাঝে নুতনভাবে ক্ষোভের দানা বাঁধতে উৎসাহিত করে। এ সময়ে দেশে দেশে অধিকারবঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত হওয়ার উদ্যোগ নিতে থাকে।

এ ধরনের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্য আবারো একটি গণবিস্ফোণোরন্মুখ অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে দাতা দেশ ও বহুজাতিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত তাদের কর্মকৌশল পরিবর্তন করে। তারা বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্বরিত সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে, সরকারি ব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্যজনিত জটিলতা কমানো এবং অর্থের যথেচ্ছ অপচয় রোধের নামে

ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান" বা NGO-দের মাধ্যমে সেবা পৌঁছানোর নতুন কৌশল গ্রহণ করে। এসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের আর্থিক অসামর্থ্যের কারণেও এক ধরনের দাতা-নির্ভর বা পরনির্ভর হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা পৌঁছাতে সক্ষম হলেও তাদের নীতি নির্ধারণেও কোন কোন ক্ষেত্রে থেকে গেল দাতা দেশ বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা।

বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর পরিচালনা অনেকটা সুসংগঠিত এবং অবয়বটাও অনেক পরিমার্জিত হয়েছে। এখনও ধনভারে পীড়িত ধনী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কখনো ব্যক্তিগত নামে কখনো ফাউণ্ডেশন কখনো বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা ট্রাস্টের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে প্রতিপালন করে আসছে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৮৮ সালে 'NGO Workshop'-G Asian Institute of Technology, Bangkok স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা NGO-র কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। "An NGO not affiliated to political parties, generally engaged in working for aid, development and welfare of the community."

"An NGO established by and for the community without or with little intervention from the Government; they are not only a charity organization, but work on socio-economic cultural activities."

বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাজ দৃশ্যমান হয় মূলত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর। যুদ্ধের পর পর ভারতে আশ্রিত ত্রাণ শিবিরগুলো হতে দলে দলে লোকজন তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়িতে ফিরতে শুরু করে। সেসময় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, খাদ্য, পুষ্টির মত মৌলিক চাহিদার অভাব লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। কৃষি ও ভৌত অবকাঠামো এতই নাজুক ছিল যা কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছিল না। যুদ্ধত্তোর দেশের মানুষের সেবার লক্ষ্যে সেসময় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো দুঃস্থ মানুষের সেবার জন্য এগিয়ে আসে। যুদ্ধত্তোর বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল কাজ ছিল ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট পুনর্গঠন, পুনর্বাসন এবং ত্রাণ সহায়তা প্রদান। অপুষ্টিআক্রান্ত মা ও শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে ঔষধ প্রদান ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা ছিল অন্যতম প্রধান কাজ। এই কাজে বিভিন্ন বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সরাসরি অথবা দেশী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোতে লাল ফিতার দৌরাত্ম কম থাকায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাদি বাস্তবায়ন সহজতর হওয়ায় বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও দাতা সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারণকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করে। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যাদি পরিচালনা করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে অনেক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেই যা প্রশংসিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের পিছনে দাতাদের নির্দেশনা অপেক্ষা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোক্তাদের দূরদর্শিতা, গণমুখী উন্নয়ন ধারার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা, সেবাধর্মী মনোভাব এবং দেশপ্রেম মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

আশির দশকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বেশির ভাগ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ছিল অনুদান-নির্ভর। আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রতি তাদের আগ্রহ খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর বৈদেশিক অনুদান ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করে। আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এক ধরনের তাড়না পরিলক্ষিত হতে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সংস্থাগুলো স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরিতে অধিক মনযোগী হতে শুরু করে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের যে ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটেছে তার মূল চালিকাশক্তিই এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এখন বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বৎসরে প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন করছে। দরিদ্র মানুষদের সঞ্চয় ও বীমার মত আর্থিক কার্যক্রমে আগ্রহী করে তুলছে। নানা ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রমের ফলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সঞ্চয় তহবিল ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। এসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অতি দরিদ্রদের মাঝে নমনীয় ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় আদায় হতে শুরু করে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ প্রদান করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তির প্রধান উৎস স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো। আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে এসব সংস্থার স্থায়ী ও তরল সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সংস্থা তাদের আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অ-আর্থিক সেবা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

অনেক দক্ষ লোকজনের সম্পৃক্ততা বাড়ছে। তাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোতে এখন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চালুর মাধ্যমে আর্থিক ও মানবসম্পদের দক্ষ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দাঁড়িয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থায়ী বা টেকসই ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য সুশাসন চর্চা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন সকল পর্যায়ে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা করা। UNDP-i Governance for Sustainable Human Development ১৯৯৭ রিপোর্ট অনুযায়ী শুধুমাত্র 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্রতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই জীবিকা নির্বাহ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন ও দুর্নীতি দমন সম্ভব। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমরা Socially just, Ecologically sustainable, Politically participatory, Economically productive and Culturally vibrant একটি দেশ গড়তে সক্ষম হব। সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

Good Governance means rule of law। সম্পদ ব্যবস্থাপনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যদি গণতান্ত্রিক উপায়ে ব্যবহৃত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসে তাহলে একে 'সুশাসন' বলা যায়। "Issues as democracy, transparency, accountability, decentralization, policy, ownership, financial integrity which are defined as key components of the process or good governance." (Sobhan, 1999)

বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'সুশাসন' এর বিষয়টি বর্তমান পর্যয়ের মত অতীতে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ এক সময় বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দাতা সংস্থার অনুদানে প্রকল্পভিত্তিক কার্য পরিচালনা করতো। ফলে সংস্থাগুলোর কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না থাকায় সংস্থায় বিশেষ করে নির্বাহী পরিষদ ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের বিষয়টি বর্তমান সময়ের মত এত গুরুত্ব পায়নি। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর অধিকতর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নিতে হচ্ছে। তাই বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোতেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বেশ আলোচিত হচ্ছে। এদেশে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে। নির্বাহী পরিষদে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের কারণ, গতি-প্রকৃতি নানাবিধ এবং বিভিন্নমুখী হলেও তার মূলেই রয়েছে 'সুশাসনের' অভাব।

বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'সুশাসন' এর বিষয়টি বর্তমান পর্যয়ের মত অতীতে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ এক সময় বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দাতা সংস্থার অনুদানে প্রকল্পভিত্তিক কার্য পরিচালনা করতো। ফলে সংস্থাগুলোর কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না থাকায় সংস্থায় বিশেষ করে নির্বাহী পরিষদ ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের বিষয়টি বর্তমান সময়ের মত এত গুরুত্ব পায়নি। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর অধিকতর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নিতে হচ্ছে। তাই বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোতেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বেশ আলোচিত হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এখনও দেশী-বিদেশী এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংস্থাগুলোর লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী, কাজের ধরন ও প্রকৃতি দিন দিন বৃদ্ধি ও বহুমুখী হচ্ছে। ফলে সংস্থাগুলোর পর্ষদ, উচ্চ ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নিয়তই ক্রমবর্ধমান। নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নে যদি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকে তবে বিপুল অংকের অর্থের অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার ও তহবিল তছরূপের সম্ভাবনা থাকে। তাই বর্তমানে সরকারি বেসরকারি সকল পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে সুশাসনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানকে একটি স্থায়ী রূপদানের জন্যও সুশাসন জরুরি।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাজের প্রকৃতি ও কর্ম-পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে দক্ষ মানব সম্পদকে সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করতে হচ্ছে। পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও চলছে। দক্ষ মানব সম্পদ নিয়োগ, দক্ষতা বৃদ্ধি, পদোন্নতি, আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিষয় কর্মী ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করা বর্তমানে একটি পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সংস্থাকে একটি টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা অন্যতম কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পেশাদারি মনোভাব, আর পেশাদারি মনোভাবকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণে প্রয়োজন সংস্থাগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং অবিরাম তার অনুশীলন করা।

মুহম্মদ হাসান খালেদ
মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

এনামুল হক খান তাপস

স্বপ্ন ভাঙ্গার গল্প

উন্মুক্ত শিক্ষার একটি ভুলুণ্ঠিত উদ্যোগ

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে ড.কুদরাত ই খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন বাংলাদেশের ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করার পাশাপাশি বাধ্যতামূলক করারও সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণে এই নীতি আর বাস্তবায়িত হয়নি।

এরপর বিভিন্ন সময়ে আরও ৮টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হলেও কার্যত কোনো শিক্ষানীতি আলোর মুখ দেখেনি। সর্বশেষ স্বাধীনতার দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পর অর্থাৎ ২০১০ সালে বহু প্রতীক্ষিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নাধীন। এই শিক্ষানীতিতে বাংলাদেশের ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন: বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নূতন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ; পর্যায়ক্রমিকভাবে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরু করা ইত্যাদি। এসবই শিক্ষার মূলস্রোতের কথা। কিন্তু যারা ইতোমধ্যে মূল স্রোত থেকে ঝরে পড়েছে কিংবা বিদ্যালয়ে গমনোযোগীবয়সে কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি, তাদের জন্য আমাদের দেশে কী কোনো ধরনের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে?

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে সর্ব প্রথম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি এবং ১৯৮৫ সাল থেকে শিক্ষার মূল স্রোত থেকে ঝরে পড়া কিংবা বিদ্যালয়ে গমনোযোগী কিন্তু কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি, এমন শিশুদের জন্য তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে আরো অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এখনো এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মসূচি শুরুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সরকারের পরিপূরক হিসেবে শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার মূল স্রোতোধারায় ফিরিয়ে আনা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুরূপ উদ্দেশ্যই বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতিতে যা বলা হয়েছে, তা হল-

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় এই ব্যবস্থায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।

বাংলাদেশের মোট স্কুল গমনোপযোগী শিশুর ৭%-৮% শিশু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় মৌলিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে এর কত শতাংশ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার মূল স্রোতোধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা শিক্ষার মূল স্রোতোধারায় ফিরে গিয়েছিলেন, তাদের একটি বড় অংশ ঝরে পড়েছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কেননা, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকার কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারী শিশু আনুষ্ঠানিক ধারার সাথে তাল মেলাতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থীই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝরে পড়ে। এছাড়াও আরো নানা কারণে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। সম্ভবত এ সব কিছু বিবেচনা করেই ব্র্যাক ৪ বছর মেয়াদি ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তন করে থাকতে পারে।

মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সফল হলেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মূলধারার সঙ্গে কার্যকর উর্ধ্বমুখী সংযোগের অভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় দীর্ঘদিন এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) এর ওপেন স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমসম্পন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক জোট গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সাথে আলোচনার সূচনা করে। কালের সাক্ষী হিসেবে যে সাক্ষ্য না দিলেই নয়, তা হল ১৯৯৮ সালের কোনো এক সময়ে অনুষ্ঠিত গণসাক্ষরতা অভিযান এর কাউন্সিল সভা শেষে স্যার ফজলে হাসান আবেদ কথা প্রসঙ্গে দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের সমন্বয়ে একটি সাধারণ শিক্ষা কোর্স উন্নয়ন করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, সাধারণ শিক্ষা-পরবর্তী কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষার্থীদের দেশে ও বিদেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হলে দেশ ও দশের উন্নয়ন ঘটবে।

এই পরামর্শ ও আলাপ আলোচনার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) ও 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং যৌথভাবে জুনিয়র সেকেন্ডারি এডুকেশন শীর্ষক একটি কোর্সের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। মূলত এই কোর্সের লক্ষ্য ছিল এনজিও পরিচালিত স্কুল থেকে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্তকারী এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী থেকে ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে সময়োপযোগী ও কার্যকর শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ তৈরির মাধ্যমে তাদের শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা, যাতে শিক্ষার্থীরা উৎপাদন-কর্মী হিসেবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

এই রূপরেখা অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মড্যুলার পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রমসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তক এবং ৭টি বিষয়ে বৃত্তিমূলক পাঠ্যবই উন্নয়ন ও প্রকাশ করে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে ৬টি নির্বাচিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা যেমন: ঢাকা আহছানিয়া মিশন, কারিতাস বাংলাদেশ, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, ভার্ক ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন এবং আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে দি রয়েল নেদারল্যান্ডস্ এমবেসি (RNE) ও সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC) এর সহযোগিতায় সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ৪০টি উন্মুক্ত দূরশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

প্রতিটি উন্মুক্ত দূরশিক্ষণ কেন্দ্রে (Open Distance Learning Center) ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ছিল কর্মজীবী। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০% নারী শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের পাঠ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের টিউটর হিসেবে নির্বাচন ও কেন্দ্রের কার্যক্রম তদারকির জন্য সুপারভাইজার নিয়োগ করা হবে। ওডিএল কেন্দ্রগুলো প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শুরু

হয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়। কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ পড়ালেখায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে একটি কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি প্রতি ২ মাস অন্তর অন্তর সভায় মিলিত হয়।

উন্মুক্ত দূরশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শ্রেণির নির্ধারিত পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক একটি বিষয়ে পাঠ্যবই পড়ার সুযোগ পায়। বৃত্তিমূলক বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হিসেবে বাউবির মাধ্যমে আইসিটি উপকরণ যেমন: বিউটি কালচার, মাশরুম চাষ, মাছ চাষ ইত্যাদি উন্নয়ন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রে বসে আইসিটি উপকরণের সহায়তায় নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সে জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে টিভি ও ডিভিডি প্লেয়ার সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বৃত্তিমূলক বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের জন্য মাঠপরিদর্শন (বিভিন্ন ফার্ম/খামার) পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের এলাকা ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত একটি বিষয়ে হাতে কলমে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীরা ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর কোর্স সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বাউবি-র আওতায় বার্ষিক পরীক্ষা আংশগ্রহণ করেছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার ৯৮% ও পাশের হার ছিলো ৯২%।

এ কার্যক্রমটি নানা কারণে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি ওপেন স্কুলের আওতায় সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ব থেকেই এসএসসি ও এইচএসসি নামে দুটি প্রি-ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম পরিচালনা করলেও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) কোর্সের মাধ্যমে উপর্যুক্ত দুটি কোর্সের সঙ্গে সংযোগ সাধন করা সম্ভব হয়। ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থী ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় মূলধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। তাছাড়া এই কোর্স সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছিল। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কোনো একটি বিষয়ে হাতে কলমে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ ছিল। ফলে একজন শিক্ষার্থীর ৮ম শ্রেণী পাস করে পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট পেশায় চাকুরী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রকল্পটি অনেকটা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের আঙ্গিকে শুরু হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে নির্বাচিত এনজিওদের মাধ্যমে এই প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যক্রমের অর্থ ব্যবস্থাপনা, লজিষ্টিক সরবরাহ ও সচিবালয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, শিক্ষক/টিউটর প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনজিওদের অংশগ্রহণে গঠিত একটি ষ্টান্ডিং কমিটি কর্তৃক কর্মসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় দিক-নির্দেশনা প্রণীত হত। সে অনুসারে গণসাক্ষরতা অভিযান নিজস্ব ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় যাবতীয় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মনোনীত ২ জন শিক্ষক প্রতিনিধি উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন।

কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ৮ম শ্রেণীর কোর্স শেষে বাউবি কর্তৃক চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে সনদ প্রদানের কথা থাকলেও দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে বিশ্বদ্যিালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত প্রশাসন চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক নানা ধরণের কাগজপত্র তলব করে। যথারীতি কাগজপত্র ও দালিলিক প্রমাণাদি সরবরাহ করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করা হলেও কার্যত কোনো ইতিবাচক ফল হয়নি। এ সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এ মডেল সম্পর্কে জানার পর এই উন্মুক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই কোর্স চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ এর কারণে তার এই আকাঙ্ক্ষা অংকুরেই বিনষ্ট হয়।

উন্নত দেশগুলোতে দলীয় সরকারের পরিবর্তন হলেও জাতীয় উন্নয়নের জন্য যেসব নীতি ও কর্মসূচি কল্যাণকর, তা কখনো পরিবর্তন হয় না বরং এক সরকারের অসমাপ্ত কর্মসূচি অন্য সরকার এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দেশেও এ ধরনের নজির নেই, তাও নয়।

এক সময় বাংলাদেশে ঔষধ উৎপাদন ও বিপণনে গুটিকতক বিদেশী কোম্পানীর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রণীত ঔষধ নীতির সফল বাস্তবায়নের ফলে আজকের বাংলাদেশে ঔষধ শিল্পের বর্তমান বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। তৎকালীন সরকার কর্তৃক সে সময় যদি ঔষধ নীতি বাস্তবায়িত না হতো, তাহলে ঔষধ শিল্পের আজকের বিকাশ সম্ভব হতো না। এক সময় বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ছিল অনেকটা সোনার হরিণের মত। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার গ্রামীণ ফোন-কে বিনে পয়সায় মোবাইল ফোনের লাইসেন্স প্রদানের

নীলিমা'র স্বপ্ন

নীলিমা বেগমের বয়স প্রায় আটত্রিশ। তিনি পরিবার পরিজনসহ যশোর জেলার আরবপুর ইউনিয়নের আরেন্দা গ্রামে বসবাস করেন ।

পাঁচ সন্তানের জননী নীলিমা বেগম যশোর জেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। আর্থিক অনটনের কারণে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পরই বাবা-মা তার তার বিয়ে দিয়ে দেন। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াকালীন সে স্বপ্ন দেখত লেখাপড়া শেষ করে সে চাকরি করে দেশের সেবা করবে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তার সেই তার স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে যায়।

২০০৭ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়েজিত এক সভায় নীলিমা বেগম দূর শিক্ষণের মাধ্যমে আবার লেখাপড়া করার সুযোগের কথা জানতে পারেন। ছাব্বিশ বছর পর আবার তার মধ্যে নতুন করে স্বপ্ন দানা বাঁধতে থাকে। নীলিমা বেগম ও তার মেয়ে এক সাথে ভর্তি হয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও আহছানিয়া মিশন কর্তৃক সংগঠিত নওয়াপাড়া দূর শিক্ষণ কেন্দ্রে। মা-মেয়ে দুজনেই এক সাথে ক্লাশে যায়। আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তির কাছে বয়সও হার মানে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করবে, তারপর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার জন্য রেজিষ্ট্রেশন করে এসএসসি পাশ করে ব্র্যাকের এনএফই স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করবে। ছোট ছোট শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর মাধ্যমে দেশের সেবা করতে পারবে।

সবকিছুই নিয়মিত চলছিল। অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস শেষ করে যখন চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসবে, সে সময় বারংবার পরীক্ষার সময় পেছাতে লাগলো। এক সময়ে সে জানতে পারে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাও নেবে না, সার্টিফিকেটও দেবে না। কথাটা শুনে কিছু সময়ের জন্য সে থমকে গিয়েছিল। তারপর অনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়েছে, পরীক্ষা নেয়ার জন্য। এমনকি দল বেধেঁ ঢাকায় এসেছিল প্রতিবাদ জানাতে। গণসাক্ষরতা অভিযানসহ সকলেই এ প্রতিবাদের ভাষা শুনেছে। তাদের পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। নীলিমা বেগমের স্বপ্ন সারাজীবন অধরাই থেকে গেল। কেবল নীলিমা বেগম নয়। আরো অনেক নীলিমা বেগমের স্বপ্নই অপূর্ণ থেকে গেছে।

মাধ্যমে সেদিন যে ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনা করেছিলেন, তারই ফলে আজকে বাংলাদেশে ১০ কোটি মোবাইল গ্রাহক, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ একটি সরকারের সব নীতি ও কর্মসূচিই ভাল বা খারাপ এমন নয়। প্রত্যেক সরকারই জনসাধারণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য নানা কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে কিছু কিছু কাজ ভাল ফল বয়ে নিয়ে আসে, আবার কিছু কিছু ভাল ফলাফল বয়ে আনতে পারে না। তাছাড়া কোনো কিছু বাতিল কিংবা বন্ধ করার পূর্বে সেই বিষয়ের ভাল-মন্দ চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

এই কোর্সটি জনাব এরশাদুল বারী উপাচার্য থাকাকালে প্রণয়ন ও পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছে বলেই কি পরবর্তী উপাচার্য এসে কোর্সটি পরিচালনার পরিবর্তে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন? এই কর্মসূচি থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সরিয়ে নেয়ার পূর্বে নীতি নির্ধারকগণ একবারও কি ভেবে দেখেছেন কতজন শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করে স্বপ্ন ভাঙ্গতে যাচ্ছেন? একবারও কি ভেবে দেখেছেন জাতির জন্য তারা কতটা ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? আগামী দিনের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার অপরিহার্যতা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার যেখানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই আর এক দল শিক্ষিত মানুষ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে শিক্ষার সুযোগ সীমিত করার কাজে ব্যাপৃত। একবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো আপনাদের মত নীতি নির্ধারকগণ জাতির জন্য আর্শিবাদ নাকি অভিশাপ?

প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ হলে একদিকে যেমন সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মৌলিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতো। অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দক্ষতা অর্জন করে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে শ্রম বাজারে প্রবেশ করার সুযোগ পেতো। একই সঙ্গে কর্ম সংস্থান হতো হাজার হাজার শিক্ষক প্রশিক্ষকদের। যার ফলে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে নূতন দ্বার উম্মোচনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত হতো।

এনামুল হক খান তাপস
ঊর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক
গণসাক্ষরতা অভিযান

শ র্ব রী আ লো ম য়ী

পৌষের আহ্বান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

রবীন্দ্রনাথের এই অমর গানের পৌষালী আহ্বান সব বাঙালির মনে নাড়া দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে পৌষের সেই পুরোনো রূপ আর অনুভব অনেকটা যদিবা হারিয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়নের জন্য বাংলাদেশের অনাদি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সেই পুরোনো দিনের মত করে আর শনাক্ত করা যায় না। তবুও হৃদয়ের তাগিদ থাকলে এখনও পৌষকে চিনে নেয়া যায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের উদার জমিনে। পৌষের শীতে গ্রামের মানুষের জবুথবু অবস্থা। বিশেষত দরিদ্রজন, তাপ যোগানো বস্ত্রের অভাব যাদের, তাদের কাছে কনকনে শীত এক ধরনের নিপীড়নও বটে। কিন্তু ওই শৈত্যের আক্রমণও এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পৌষকে অভিবাদন জানাতে নিবৃত্ত করতে পারে না। কারণ পৌষের সঙ্গেই তো আমাদের কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন সম্পর্কের সবচেয়ে জোরালো যোগ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ওই গান থেকেই বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের চিত্রটা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। একটা পূর্ণতার চিত্রের আভাস পাই আমরা। ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন নিপুণ চিত্রশিল্পী। তাঁর ছবি আঁকার মুনশিয়ানা দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'অবন ছবি লেখে'। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় যেভাবে প্রকৃতির চিত্র ধারণ করেন, তাতে বলা যায়, তিনি লেখা আঁকেন। ওই গানটির তৃতীয় পংক্তিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পাকা ধানের ক্ষেতে দিগবধূরা হাওয়ার নেশায় মেতে উঠছেন এবং সোনা রঙ রোদ ছড়িয়ে পড়ছে মাটির আঁচলে। কল্পনার পথ ধরে বেশি দূরে হাঁটবার প্রয়োজন নেই। পৌষের আনন্দের হাওয়া লাগা গ্রামে ফসল ঘরে ওঠানোর উত্তেজনায় গাঁয়ের বধূরা আর ঘরে থাকতে চায় না। শীতের প্রকোপ হ্রাস করিয়ে দেয়া মিঠে রোদের আমন্ত্রণে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মাঝে মুক্তির একটা সংকেতও সৃষ্টি করেন। 'ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো খোলো দুয়ার খোলো'। মুক্তির বা প্রাণের ওই সংকেতটাকে রবীন্দ্রনাথ আরো অর্থবহ করে তোলেন, যখন তিনি *রক্তকরবী* নাটকে এই গানটিকে সংযোজন করেন। নাটকের কোন চরিত্র এই গান গায় না। তিনি আবার ওই নাটকের যক্ষপুরীকে একটি সত্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ার স্থান হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। সেই স্থানের প্রতিবেশী দূরত্বে গ্রামের কৃষককূল এই গান গাইতে গাইতে পৌষকে বরণ করে নেয়।

প্রকৃতির সেই নজর কাড়া হৃদয় ভরানো রূপটা তো অদ্যাবধি হারিয়ে যায়নি। ব্যবহারিক কারণে দেশে আবশ্যিকভাবে শিল্প কারখানার বিস্তার ঘটলেও এখনও বাংলাদেশ এক বিশাল গ্রাম হিসেবে অস্তিত্বমান। নগর সভ্যতার আগ্রাসনে গ্রামের সীমানায় হেরফের ঘটেছে, কিন্তু তারপরেও এটাও আমাদের জন্য পরম পাওয়া যে, এখনও সেই শাশ্বত গ্রামের ঠিকানা আমাদের আশ্রয় হয়ে বেঁচে আছে, এখনও আমাদের হৃদয়ের অন্দরে ফসলের ঘ্রাণ জেগে ওঠে। আধুনিক কালের সব প্রভাব ছাড়িয়ে পৌষ যে

আলাদা একটা সময়গ্রন্থিকে চিহ্নিত করে, তা বোঝা যায়।

যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান নগরগুলোর সীমাহীন জনারণ্য সাম্প্রতিক কালে যেন আর বুঝতে দেয় না, এদেশের অনাদি প্রাকৃতিক ঋতুচক্রের এক ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য ছিল। আনন্দ ও প্রাচুর্যের পসরা নিয়ে পৌষ ভরে দিত আমাদের। কনকনে শীতের প্রহরেও সঙ্গীতের স্বরলিপির মুখরতা তৃপ্তি এনে দিত। কুয়াশা এসে আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়, বেগবান শহরে এখন গাড়ির তীব্র আলোর প্রবল অভিঘাত ঘোষণা করে তার প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার আহ্বান। অথচ কথা ছিল তাকে পরম প্রীতিতে আলিঙ্গনের। হারাতে হারাতে দিন দিন সব খোয়াচ্ছি আমরা, আছে শুধু অতীত পানে চাওয়া স্মৃতির বিলাস। পৌষের উৎসবও আমাদের কাছে যেন স্মৃতিমুখর। স্মৃতির এই সম্পদকে হেলা-ফেলা করাও তো ঠিক নয়। যা হারিয়ে যায় তা আগলে রাখার আর্তি আবার কখনোবা সুনিপুণ জেদই আমাদের বেঁচে থাকার নেশার সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

আমাদের সংস্কৃতির জমির মধ্যিখান, আশপাশ, আল, মেঠোপথ, রাজপথ যে কোন দিক দিয়েই হাঁটি না কেন, দেখতে পাই সমুখে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্র ঠাকুর। এ আমাদের এক পরম সৌভাগ্য যে, তিনি জন্মেছিলেন এই দেশে, রবির আলোকছটা এখনো আমাদের আলোকিত করে, চিরকালই করবে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানে যেভাবে তিনি বাংলার ষড়ঋতুকে বন্দনা করেছেন, তার জুড়ি মেলা ভার। আবার অনেক গানেই অবশ্য তিনি প্রকৃতির রূপ ছাড়িয়ে শক্তির অন্তর্গত ভুবনের বহুমুখী অনুভবকে স্পর্শ করেছেন। তাঁর এসব গান যেমন প্রকৃতির রূপ বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে অনেক সময়ই ব্যক্তি হৃদয়ের কোন একাকী বেদনা ও অভিজ্ঞতাকে নাড়া দেয়, তেমনি পৌষের ডাক দেয়া এই গানের বাণীতে একটা সামষ্টিক চিত্র আমরা দেখতে পাই। এই গানের ছন্দে এমন এক সম্মিলনী সুর বেজে ওঠে যাতে মনে হয়, যেন গাঁয়ে কোন কলহ বিবাদ নেই, জাত পাত নেই, দল উপদল নেই। উৎপাদিত ফসলের নেশা, শ্রমের সফল পরিণতি যেন গ্রামের সব মানুষকে অবাধ খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এসব নিয়ে অনেক বিশ্লেষণী বা গভীর আলোচনার অবতারণা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের গানের ওই ভাবসম্পদ নাকি তার অমৃত সঞ্চারী গীতসুধা, কোনটি যে প্রধান, সেই বিতর্কের মীমাংসা করার কোন নিদান কবির নিজেরও জানা ছিল বলে মনে হয় না। প্রকৃতির কোলে মানুষকে সংস্থাপন করে তিনি হয়ত আমাদের এক সুদূরপ্রসারী নির্দেশনা দিতে চেয়েছেন। আজ সেকথাকে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের দু'টি গান ছাড়া যেন আমাদের নির্দিষ্ট দুই ঋতু বা মাসকে বরণ করে নেবার কোন উপায়ই নেই। বর্ষবরণের জন্য 'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো' যেমন আমাদের গাইতেই হবে, তেমনি শীতকে আহ্বান করার জন্য অথবা প্রকৃতির আপাতরুক্ষতার মধ্যে পৌষকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠতে হলে আমাদের গলায় আবশ্যিকভাবে তুলে নিতে হবে, 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আয় আয় আয়'। অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে বাংলায় পৌষ প্রকৃতির রূপ অঙ্কন করেন তিনি।

পাকা ফসলে বাংলার মাঠ ভরে আছে। সেই ভরা ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বর্তমান ও আগামীদিনের প্রাচুর্য, যাকে আজকে অর্থনীতিবিদদের ভাষায় বলা হয় 'খাদ্য নিরাপত্তা'। মাটির আঁচলে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়েছে, আনন্দে ফসলের মাঠে বাঁশির সুর শোনা যায়, সেই সুরের ডাকে কে আর ঘরে বসে থাকতে পারে, দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসা দিগবধূদের পায়ে যেন নাচের ছন্দ। সৃষ্টি ও পূর্ণতার, শ্রমের ও ফসলের এক চমৎকার মিলন দেখা যায় পৌষের ভোর থেকে সারা দিনমান।

পৌষের মধ্যে প্রাণের বিপুল তরঙ্গ আছে। সেকথা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর *রক্তকরবী* নাটকের যক্ষপুরীর ভয়ানক যান্ত্রিকতার প্রতিপক্ষে এই গানের সমবেত সুর সংস্থাপন করেছিলেন। নন্দিনী সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে, সেই সুরে যোগ দেবার জন্য। পাকা ফসল কেটে গোলায় তোলার এসে শরিক হতে সে সবাইকে ডাক দিচ্ছে। আলাদা একটা প্রতীকী অর্থ জুড়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। পৌষের যে স্বতন্ত্র একটা আবেদন আছে, আহ্বান আছে বাঙালির জীবনে, সেই কথাটা যক্ষপুরীর সীমান্তেও পৌঁছে দেন তিনি। বাংলার প্রকৃতির এক অনন্য রূপ ফুটে ওঠে পৌষের দিনগুলিতে; শুধু তাই নয় পৌষ যে আমাদের এই কৃষিভিত্তিক সমাজের কেন্দ্রে প্রশান্তি, শান্তি ও সম্ভারের হাসি ফুটিয়ে তোলে, আমাদের জীবনে উৎসবের মেজাজ নিয়ে আসে, তা-ও প্রকাশিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের ওই গানে।

বাঙালির পৌষ, সে তো অজানা আদ্যিকালের। আমাদের সুদূর অতীতে পূর্বপুরুষরা পৌষ পোহাতেন নিশীথের শিহরণে, দুপুর গড়ানোর পর ঝুপ করে নেমে আসা সন্ধ্যায়, নারিকেল, আম-জাম-হরিতকী-তমাল বৃক্ষের অপরাজিত পাতার ফাঁক গলে আসা সকালের রোদ্দুরে, ইতস্তত কিছু সময়ের নিম-বাধা সরিয়ে সরষে তেলমাখা চকচকে শরীরটা পুকুরের জলে নিক্ষেপ করে, মধ্যাহ্নভোজের পর পলাতকা সূর্যের দিক পিঠ পেতে দিয়ে। ধান ভানা হত, শুধুই কি শিবের গীত, তা নিশ্চয়ই নয়, কার ঘরে বিবাহযোগ্যা কুমারী, কার ঘরে পোয়াতি, হাটবারে কী সব সওদা এনেছিল খোকার বাপ, কে এসেছে নাইয়রে, কোন্ চাষীর এই পৌষেও কপাল মন্দ, এমন কত সব পাঁচালি। স্বর্গে গেলেও যে ঢেঁকির কপালে লেখা থাকে ধান ভানার খাটুনি, নির্বিবাদে সে শুনে যেত পৌষের কাহিনী।

প্রাচুর্য, পূর্ণতা ও খুশির সঙ্গে পৌষের একটা মৌলিক যোগ

আছে। আমাদের গাঁও-গেরামের সেই ঐশ্বর্যময় রূপ এখন আর তেমনভাবে চোখে পড়ে না। গান গেয়ে ফসল কাটছে এমন চাষীর দেখা হয়ত পাওয়া যাবে না অনেক কষ্টের পরও। তবে অমন গ্রাম যে একেবারেই হারিয়ে যায়নি, সে তো আমরা জানি। আমাদের খোঁজার প্রত্যাশায় সেইসব গ্রাম হয়ত লুকোচুরি খেলে মনের ভাবনায়, তৃষায়। সেইখানে হাঁটলেই অমন প্রান্তরের দেখা মেলে।

কিন্তু পৌষ মাস যে সাধারণভাবে সকলের জন্য সুখের বারতা বয়ে আনত সে কথা বোঝা যায়। একটা জনপ্রিয় প্রবচন অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। সর্বনাশের ঠিক বিপরীতে পৌষ মাসকে স্থাপন করে মোক্ষম এক অর্থ সৃষ্টি করা গেছে এই প্রবচনে। সর্বনাশের চরিত্র হরেক রকমের হতে পারে, দৈব-দুর্বিপাক থেকে, মৃত্যু, দুর্ভাগ্যের পীড়ন, নানা কিছু। কিন্তু তার বিপরীতে পৌষ মাস বলে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে, এই মাসের অন্তরে সুখ আর আর্শীবাদের লক্ষণ আছে। যে ব্যক্তি নিঃস্ব, ভাগচাষী, বর্গাচাষী, ভিক্ষুক সবার জন্যেই পৌষ মাসের কিছু উপহার আছে। গাঁয়ের শিশু-কিশোর থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই বুঝতে পারে ফসল কাটার সঙ্গে খুশির বাতাস বইতে থাকে।

বাংলার সব মাসেরই আলাদা মাহাত্ম্য আছে, তবে দুই পরম বিপরীত তাপমাত্রার জষ্ঠি আর পৌষের কাসুন্দির আছে ভিন্ন আভিজাত্য, সেকথা না মেনে উপায় নেই। জষ্ঠিতে যেমন আম-জাম-কাঁঠালের মউ মউ গন্ধের নেশা, পৌষে তা যেন ধানের গোলা ভরার। নতুন ফসলের কাছে ক্লান্তি হার মানে। মরা কার্তিকের অবশেষ থেকেই যেন পৌষের জন্য ভজনা শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মাঠ মেতে ওঠে ফসলী হাওয়ায়। প্রান্তজন যে অভাবের ছায়াটাকে বসতভিটা থেকে তাড়াতে নিত্যদিন প্রাণান্ত, তার চিবুকে তৃপ্ত হাসির টোল ফোটাতে পৌষের জুড়ি মেলা ভার। ওই রবীন্দ্রনাথ যখন গান রচনা করেন, তিনিও পৌষের মধ্যে যেন এক মহিয়সী, কৃপাবর্ষী, সুখদায়িনী প্রকৃতির উর্বরা রূপ দেখতে পান; পৌষ হয়ে যায় যেন এক স্নেহময়ী মানবী, তাই সে আমাদের ডাক দিতে পারে পরম উষ্ণ সম্ভাষণে।

অনাহারী অর্ধাহারী মানুষের মুখেও জুটে যায় নতুন ধানের গন্ধমাখা অন্ন। চাল থেকে তৈরি হয় গুঁড়ি, কী অসাধারণ শুভ্র তার রূপ। এমন ফসল ভরা মৌসুমে নিরন্ন থাকার দিনগুলির দুঃখ-কষ্ট অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাই শুধু পেট পুরে অন্নগ্রহণের সুসমাচারেই গাঁয়ের মানুষ তুষ্ট নয়। নতুন চালের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হয় কত রকমের রসনাপ্রবল খাবার। ভাঁড়ারে ধান চাল রাখার এই আনন্দ নতুন করে মাতিয়ে তোলে বিলাসী হতে। পিঠা বানানোর জন্য কুমোর বানায় নানা মাপের পোড়ামাটির তৈজসপত্র। দিন গড়িয়ে রাতের প্রহর গভীর হয়, তবুও অনেক গেরস্ত বাড়ির হেঁসেল গমগম করতে থাকে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে কোমরের দড়ি গাছের সঙ্গে মালার মত গেঁথে গাছুড়ে বেঁধে দেয় মাটির কলসী খেজুর গাছের গলায়। শিশির-ভেজা, গাছের হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসা সুধাময় রস যখন কাঠের উনোনে রূপান্তরিত হয় নলেন গুড়ের সম্ভারে, কী অপরূপ মদিরাময় তার গন্ধ, গাঁয়ের সবাই যেন সুবাসিত হয়ে ওঠে। এই হল আমাদের পৌষ। পেটে ভাত আছে বলেই এমন কনকনে শীতেও গলায় উঠে আসে গান, কত রকমের লোকজ সুর, পালা-গান, কথকতা, যাত্রা। পিঠে বানানোর ধূম পড়ে যায়। কত রকমের পিঠা, কত বাহারী তার রূপ, নাম, কী জিভে জল আনা স্বাদ। কিশোর-কিশোরীরা চুলোর চারপাশে বসে থাকে। তাতে দু'রকম আনন্দ জোটে। আগুনের আঁচ থেকে আসা তাপ শরীরটাকে জুড়িয়ে দেয় বাইরের শৈত্য থেকে, আর সবার আগে টাটকা তাজা গরম পিঠের স্বাদটাও জুটে যায়।

বাংলার গ্রাম জুড়ে যখন ধান দিয়ে গোলা ভরার আয়োজন, আর শস্যক্ষেতে সরষে ফুলের চোখ-জুড়ানো গালিচা, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার সাথে সাথে যাত্রা-পালার দর্শকরা প্রস্তুতি নিতে থাকে শীত মোকাবেলার। গ্রামীণ সংস্কৃতির পরম দোসর যাত্রাপালার এই সব শিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রী, বাজনদার যেন সারা বছরটা জুড়ে পৌষ মাসের অপেক্ষায় থাকে। যাত্রাপালা শোনার জন্য ক'টা টাকা বিনিময় মূল্য তো দিতে হয়। গরিব মানুষের কাছে বেশি সময় তো তা আর থাকে না। কিন্তু এই পৌষ যে গ্রামীণ সমাজে অভাব তাড়িয়ে প্রাচুর্য বয়ে আনে। বর্গাচাষী তার ধানের ভাগ পায়, পাকা ফসল কাটার জন্য ক্ষেতমুজররাও অপেক্ষাকৃত বেশি মজুরি পায়। সবার মনে এমন সুখের আবহ তৈরি হয় বলেই তো যাত্রা-পালার নাচ-গান আর আবেগ অনেক বেশি মূর্ত হয়ে ওঠে।

পরিবারের সবাই মিলে মটরশুটির খোসা ছাড়ায়, নববধূ বেতের পেয়ালায় গরম ঝাল-মুড়ি পরিবেশন করে দাওয়ায় বসে থাকা মানুষদের। তাদের মধ্যে জমে ওঠে প্রাণ খোলা আড্ডা। দুয়ার খুলে যেন সব গ্রামবাসী বেরিয়ে পড়েছে খুশির খবর ফেরি করার জন্য। যে বৃদ্ধাকে দেখে দু'মাস আগের কার্তিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কোন সম্পন্ন কৃষক বা মহাজন, তাকেই আজ ডেকে বলে, 'একটু বসে যাও না কেন, গরম ভাপা তৈরি হচ্ছে, যেমন খুশি খাও, শুকনো অথবা রসে ভিজিয়ে'। মানুষের চিত্তাকাশ যেন নীল আকাশের মত স্বচ্ছ সুন্দর হয়ে ওঠে, কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। অন্যসময় কাজে সামান্য খানিক ভুল হলে যখন বাড়ির বড় বউকেও শাশুড়ির নিন্দামন্দ শুনতে হত, পৌষের প্রভাবে সেই তারও মনটা খুব ফুরফুরে, তেলের শিশি ভাঙলেও বলে ওঠেন, 'ও কিছু নয়, হাটবারে নবীন আর এক বোতল জবাকুসুম কিনে আনবে'। অবশ্য আজ দুলর্ভ হয়ে গেছে এমন সব মানবিক লগ্ন।

সেই সব দৃশ্যে আনন্দের এক সর্বব্যাপী রূপ অনিবার্য হয়ে ওঠে আমাদের অভিজ্ঞতায়। এই প্রাচুর্য আর বাঙালির সম্মিলিত তৃপ্তিকে একটা রুচিময় বিন্যাসে, অনেকটা সুরের স্বরলিপির নিটোল ছকে বাঁধার একটা পরিকল্পনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ পৌষ মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে একটা ঐক্যের সেতু রচনা করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের একটা ভিন্নতর উদ্যোগ যদিবা ছিলো আদি জন্মকথায়, কিন্তু তাকে প্রকৃতই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ এবং প্রকৃতি অনুসারী করে তোলার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের শান্তি নিকেতনে পৌষ মেলার এক জনমানুষিক বাস্তব চিত্র অঙ্কন করলেন, বাস্তবে রূপ দিলেন।

এই আয়োজনের বড় কোন ধরনের ভৌগোলিক বিস্তার বা অনুসৃতি ঘটেছিল, তেমন কোন দাবি করা যাবে না। যা ঘটল, তা হল সঙ্গীতপ্রিয় কলাপ্রিয় কোলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী উপনিবেশবাদীদের ফেলে যাওয়া বড়দিন উৎসব উদযাপনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার নেটিভ পার্বণটাকেও যুগলবন্দীর মধ্যে বাঁধল। রথ দেখা কলা বেচার মধ্যে যে আনন্দলাভ ও অর্থলাভের বন্ধন থাকে, সেটা বোলপুরী পৌষমেলার বেলায় গ্রাম দর্শন এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটানোর অভিপ্রায়ে ভিন্ন মাত্রার বিকল্প খুঁজে পেল। এমন একটা গ্রাম অভিমুখী শহুরেপনার অভ্যাস বৃদ্ধি পেতে লাগল কোলকাতায় এবং তা আজো অম্লান।

পাকিস্তান সৃষ্টির শেকড়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার এমন সম্প্রচার ছিল যে, পূর্ব বাংলার বাঙালিরা আলাদা করে স্বাধীনতার কোন স্বাদ পাওয়ার আগেই একটা সার্বিক সাংস্কৃতিক অবরোধের মধ্যে পড়ে যায়। ফিরে চল মাটির পানে গানের সুরটা ঢাকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে বাজতেই থাকে ফেব্রুয়ারির বাসন্তী বাতাসে, 'যখন মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা'র মত এমন মৃত্তিকালগ্ন সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মিলে যায় ভাষার সঙ্গে রক্তের যোগ; বৈশাখের দারুণ অগ্নিবাণের আঘাত তুচ্ছ করে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ে লাখো বাঙালি বর্ষবরণের বন্দনা-গান গাইতে গাইতে; ঝর ঝর মুখর বাদল দিনেও নিজস্ব সংস্কৃতির তীর্থযাত্রার আয়োজন চলতে থাকে অবিশ্রাম, অবিরাম।

পৌষের সঙ্গে ফসল তোলার, গোলা ভরার যোগ আছে, সে কথা তো আগেই বলেছি। গ্রামের অর্থনীতির পুষ্টি যোগায় পৌষ। সেইজন্যই এমনই এক আর্থ-সাংস্কৃতিক ধারাক্রমে গাঁয়ের হেঁসেল থেকে বাঙালির পিঠা উঠে এসে জাঁকিয়ে বসল ঢাকা নগরের সবচেয়ে ভিড়-ভাট্টার ব্যস্ততার শীর্ষকেন্দ্রে, পিঠা বানানোর কৌশলে আল্পনার নকশায় গ্রাম আর নগর এক হয়ে গেল। শহরের লোকের ধূমধামে ভিন্ন মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, পিঠা বানানোর প্রতিযোগিতা বসল, তার ঢেউ গিয়ে লাগলো গাঁয়ে, সেখানে নানান জাতের, গোত্রের ইন্দ্রিয়-জাগানিয়া পিঠার মেলা। পার্বণপ্রিয় বাঙালি কর্মের তাড়নায় সুযোগের খোঁজে মাথা গোঁজে শহরের বৃত্তে, কিন্তু তার হৃদয়টা পড়ে থাকে গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথে। সেই পথ এসে মেশে ঢাকার নানা প্রান্তরে। দেশটা তো এখনো গ্রামকেন্দ্রিক, যদিও নগরের উপনিবেশও ক্রমবর্ধমান। তাই দোনো প্রান্তের আলিঙ্গনে পৌষের আহ্বানে বৈদ্যুতিক আলোর ঝলমলানির মধ্যেও পৌষালী উৎসবে মিলিত হবার প্রবল-গভীর টান আমাদের দোল দিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাকে দিয়েই শেষ করতে চাই। কিন্তু হঠাৎ করে সেই বিখ্যাত ইংরেজ কবির পরম আশাভরা এবং বহুল পরিচিত পংক্তিটার কথা মনে পড়ে গেল। শীত যদি নিপীড়ন নিয়ে হাজির হয়, বুঝতে হবে বসন্তের আগমনের আর খুব বেশি দেরি নেই।

আমাদের সকলের প্রিয় রোমান্টিক কবি পার্সি বিশী শেলী ঝড়কে নিয়ে লেখা একটা কবিতায় নিপুণ ও প্রবল কল্পনার শক্তিতে শীত আর বসন্তের যৌথতা নিয়ে অপরূপ অমর এক পংক্তি রচনা করলেন। বিপর্যয়কর সময়ের বিন্দুতে আশার রূপমূর্ছনা সৃষ্টি করলেন। এক মহামানবিক দার্শনিকতায় তিনি লিখলেন: If winter comes, can spring be far behind? অজেয়, অনিঃশেষ কবির এই বাণী সেদিন থেকে অদ্যাবধি মানুষকে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

ইউরোপ বা শীতপ্রধান দেশে শৈত্যের প্রকোপের মধ্যে থাকে একটা সংহারী রূপ। সে আমাদের বাংলার পৌষের মত সুখপ্রদায়িনী নয়। রবীন্দ্রনাথ পৌষের সুফলা শস্যশ্যামলা রূপ দেখেছেন, তার সঙ্গে আমাদের সমাজের নানা পার্বণ, পিঠা-পুলি, পায়েস ইত্যাদির অনুষঙ্গ জুড়ে যে তৃপ্তির ঘোর সৃষ্টি হয় তা অনুভব করেছেন এবং অবশ্যই একথা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন যে, এই পৌষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে থাকে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি। কিন্তু তিনিও যখন জীবনটাকে সামগ্রিকভাবে দেখেছেন তখন বুঝতে পারেন পৌষের শৈত্যদিন পেরিয়ে বসন্তের ফাল্গুনী প্রহরের যে মিলে যাওয়া, সেটাই জীবনের লক্ষণ। বিশ্বভুবনে শান্তির বড়ই অভাব এবং অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে। কিন্তু জীবনকে তো চলমান থাকতেই হবে সব সময়। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত সব ঋতুতে। জীবন মানেই দ্বন্দ্ব-ছন্দ, জীবন মানেই 'কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'। আর সেজন্য এ কোন বিস্ময় নয় যে, রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান*-এ এটাই 'পূজা' পর্যায়ের অথবা এই গ্রন্থের সর্বপ্রথম গান।

শর্বরী আলোময়ী
শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী

ফা র দা না আ ল ম সো মা

দাহ-যাতনা ও তার প্রতিকার

২০১৫ সাল আসার আগে থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ডাকে নববর্ষের কার্ডের মাধ্যমে পরস্পরকে শুভকামনা জানিয়েছি আমরা। বিদায় নেয়া বছরের শেষ পক্ষকালেও আমরা ঠিক আঁচ করতে পারিনি, আগামী বছরের শুরুতেই আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। নতুন বছরের শুরু থেকেই সেই যে অবরোধ, চলছে তো চলছেই। তার সঙ্গে থেকে থেকেই যোগ হয়েছে হরতাল। এই হরতাল-অবরোধে আগুনে পুড়ছে দেশ, পুড়ছে মানুষ।

প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হচ্ছে পেট্রোল বোমা হামলা। আর নৃশংসভাবে পুড়ছে মানুষ। এদের কেউ মারা যাচ্ছে আবার কেউ মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। প্রতিদিনই গণমাধ্যমে এসব যন্ত্রণায় কাতরানো মানুষের বীভৎস চেহারা দেখে আমাদের বুক দুমড়ে-মুচড়ে ওঠে, চোখ ভিজে যায়। আমরা যারা দেশের সাধারণ মানুষ, তাদের কাছে এসব বন্ধের কোন উপায় জানা নেই, তেমন কিছু করারও নেই। আবার একটানা এতদিন বাইরের কাজ কর্ম বন্ধ করে ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। তাই আমরা প্রতিদিন ঘরের বাইরে যাচ্ছি, গাড়ি ঘোড়ায় চড়ছি আর যাদের ভাগ্য দেবতা নারাজ তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

দেশের এই পরিস্থিতিতে যদিওবা সাধারণ মানুষের তেমন কিছুই করার নেই তথাপি একটু সচেতনতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করলেই আগুনজাত অনেক বড় ক্ষতির হাত থেকে হয়ত বাঁচা যাবে। চলতি পথে হঠাৎ করে আগুন লাগলে কিছু সাবধানতা অবলম্বনের কথা জানা থাকলে হয়ত বিপদের মাত্রা হ্রাস পাবে।

যদি বন্ধ জায়গায় যেমন যানবাহন, বন্ধ ঘর ইত্যাদি স্থানে আগুন লেগে যায় তাহলে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ স্থানে সরে আসুন। নিজের গায়ে আগুন লাগলে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি না করে-শুয়ে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়া উচিত। প্রয়োজনে মুখগহ্বর ও নাকে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা পরিষ্কার করুন। পোড়া জায়গা থেকে পুড়ে যাওয়া কাপড় সরিয়ে বিশুদ্ধ পানি ঢালুন। দ্রুত লম্বা লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। পুড়ে যাওয়া শরীরের অংশে শুধুমাত্র পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিকটস্থ হাসপাতাল বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

বর্তমানে পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ হচ্ছেন, কিন্তু এছাড়াও আমাদের দেশে হরহামেশাই আগুন ও আগুনজনিত দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। যেমন, গরম পানি, গরম তেল, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক পদার্থ এসিড, ক্ষার ইত্যাদি থেকে মানুষের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয়। পুড়ে যাবার কারণ যাই হোক না কেন, পোড়ার ধরন অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হবে।

চামড়ায় পোড়ার গভীরতা, আক্রান্ত স্থানের ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতার ওপর ভিত্তি করে পুড়ে যাওয়া বা বার্নকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। আর এ ভাগগুলোর ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই এ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকা দরকার।

এক ডিগ্রী বার্ন বা পোড়া

যখন চামড়ার উপরিভাগের একটি স্তর পুড়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শরীরের চামড়া লাল অথবা গোলাপি অথবা হালকা গোলাপি হয়ে যায় তখন তাকে এক ডিগ্রি বার্ন বলা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থান সামান্য ফুলেও যেতে পারে, আবার ফোস্কাও পড়তে পারে এবং একটু ব্যথাও হতে পারে।

দীর্ঘ সময় বা দীর্ঘদিন ধরে রোদে কাজ করলে অথবা তীব্র রোদে বেশিক্ষণ থাকলে অথবা আগুনের আঁচ বেশি লাগলে অথবা ফুটন্ত পানি শরীরে পড়লে এ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

এক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানে ঠাণ্ডা পানি ঢাললে বা বরফের সেঁক দিলে উপকার হবে। ব্যথা বেশি হলে ক্ষতস্থানে ব্যথানাশক মলম লাগাতে হবে অথবা ব্যথানাশক ওষুধ খেতে হবে। ঠাণ্ডা পানিতে ভেজানো পরিষ্কার কাপড় আক্রান্ত স্থানে ব্যাণ্ডেজের মত খানিকটা সময় বেঁধে রাখতে হবে। নতুন করে যাতে ক্ষতস্থানে কোনো আঘাত বা ঘষা না লাগে সেটা লক্ষ রাখতে হবে। সাধারণত এ জাতীয় পোড়া কোনো

ক্ষতিকর প্রভাব বা দাগ ফেলা ছাড়াই এক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। তবে যাদের বাইরে রোদে কাজ করতে হয় বা চুলোর তাপ সহ্য করে বাবুর্চির মত কাজ করতে হয়, তাদের সতর্ক হয়ে কাজ করা ছাড়া তেমন কিছু করার নেই।

দুই ডিগ্রী পোড়া

যখন চামড়ার উপরিভাগের দুটি স্তরের প্রথম স্তর সম্পূর্ণভাবে এবং পরবর্তী স্তর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে দুই ডিগ্রী পোড়া বলে। এক্ষেত্রে পুড়ে যাওয়া স্থান লাল হয়ে ফোস্কা পড়বে, প্রচণ্ড ব্যথা হবে, ফুলেও যেতে পারে। এছাড়া পোড়া স্থান থেকে পানির মতো রস বের হতে পারে অথবা ভেজা ভেজা থাকতে পারে।

সাধারণত গরম পানি বা গরম তরকারি জাতীয় কিছু পড়লে, কাপড়ে আগুন লেগে গেলে এবং তা দ্রুত নিভিয়ে ফেললে, মোমের গরম তরল অংশ সরাসরি চামড়ায় পড়লে, আগুনে উত্তপ্ত কড়াই বা এ জাতীয় কিছু খালি হাতে ধরলে বা শরীরের কোনো স্থানে এগুলোর স্পর্শ লাগলে এ ধরনের ক্ষত হতে পারে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হবে। ক্ষতস্থানে সরাসরি বরফ, কোনো ব্যথানাশক ওষুধ, ডিম, পেষ্ট ইত্যাদি লাগানো যাবে না। এ জাতীয় পোড়ার চিকিৎসা বাড়িতে নয়, হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে গিয়ে করাতে হয়। উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধ সেবন করলে অন্তত দুই সপ্তাহ লাগবে এই ঘা শুকাতে।

তিন ডিগ্রী পোড়া

যখন চামড়ার উপরিভাগের দুটি স্তরই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চামড়ার নিচে থাকা মাংসপেশী, রক্তনালী, স্নায়ু ইত্যাদিও আক্রান্ত হয় তখন এ জাতীয় পোড়াকে তিন ডিগ্রী পোড়া বলে।

এক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থান কালো হয়ে চামড়া পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। ক্ষতস্থান অনেকখানি ফুলে যায়। ক্ষতস্থান স্পর্শ করলেও ব্যথা অনুভূত হয় না। সরাসরি আগুনে পুড়লে, বিদ্যুতায়িত হলে, ফুটন্ত পানি বা তেল সরাসরি শরীরে পড়লে, উত্তপ্ত ধাতব কড়াই, পাতিল বা তাওয়া শরীরে পড়লে এধরনের ক্ষত হতে পারে।

এধরনের পোড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব আগুন বা গরম পদার্থ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। ক্ষতস্থানে দ্রুত সাধারণ তাপমাত্রার পানি ঢালতে হবে। সম্ভব হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ট্যাপের পানির নিচে বসিয়ে দিলে ভালো প্রতিকার পাওয়া যাবে। পুড়ে যাওয়া কাপড় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার কাপড় বা গজ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। হাত-পায়ের আঙ্গুল পুড়ে গেলে তা আলাদা আলাদাভাবে ব্যান্ডেজ করতে হবে। অন্যথায় একটার সঙ্গে অন্যটা জোড়া লেগে যেতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে ছাড়ানো কঠিন হবে। আক্রান্ত স্থান যাতে একটু উঁচুতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকলে এবং মুখে খাওয়ার মত পেশীগত অবস্থা থাকলে পানিতে একটু লবণ মিশিয়ে বা শরবত করে খেতে দিতে হবে, স্যালাইন বা ডাবের বা খাওয়ার পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করতে দিতে হবে।

তবে এমন পোড়ার চিকিৎসা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে করাতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ জাতীয় পোড়ায় সাধারণত পোড়া স্থানের অপারেশন বা স্কিন গ্রাফট করার দরকার হয়, তাই প্রথম থেকে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষায়িত হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করা জরুরি।

বিদ্যুায়িত হয়ে পোড়া

সাধারণত অধিক ভোল্টেজের বিদ্যুৎ যখন শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন কোষগুলো পুড়ে যায়। অধিক সময় ধরে এ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে পুরো শরীর কালো কয়লার মতো হয়ে যায়। এ রকম হলে সাধারণত মৃত্যু ঘটে। তবে অল্প সময় বিদ্যুতায়িত হলে দুই ডিগ্রী বা তিন ডিগ্রী পোড়ার সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎতায়িত হয়ে পোড়া অনেক সময় খালি চোখে দেখা যায় না। তাই এমন হলে অবহেলা করা যাবে না। অবশ্যই আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিদ্যুতায়িত হলে বন্ধ্যাত্ব ঘটতে পারে, কিডনির সমস্যা হতে পারে এমনকি হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে মৃত্যুও হতে পারে।

রাসায়নিক পদার্থে পোড়া

এসিডের মত রাসায়নিক পদার্থ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চামড়ায় ভয়াবহ ক্ষত সৃষ্টি করে। সাধারণত রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে আগুন লেগে পুড়লে তখন তা হয় তিন ডিগ্রী পোড়া। এই পোড়া রক্তনালী, মাংসপেশী, স্নায়ু অকেজো করে দেয়। তবে এ জাতীয় পদার্থ দেহের সংস্পর্শে আসামাত্র পানি ঢাললে বা পানিতে নামলে বা ট্যাপের নিচে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে রাসায়নিক পদার্থ ধুয়ে ফেললে ক্ষতি অনেক কমিয়ে আনা যায়।

আগুনে পোড়ার ক্ষতি থেকে রক্ষার সাধারণ কিছু সতর্কতা

- সহজে খুলে ফেলা যায় এমন পোশাক রান্নার সময় ব্যবহার করুন। কিন্তু ঢিলেঢালা কাপড় পরবেন না।
- ওড়না বা শাড়ি বিষয়ে সবসময় সাবধান থাকুন।
- মাটির চুলার তিনপাশে অন্তত আড়াই ফুট দেয়াল তুলে দিন।
- ঢাকনা বা চিমনিযুক্ত বাতি ব্যবহার করুন। এমনকি মোমবাতি ব্যবহারের সময়ও সতর্ক থাকুন।
- রান্না শেষে গ্যাসের চুলা বন্ধ করুন, লাকড়ি চুলায় ঠাণ্ডা ছাই ঢেলে নিশ্চিত হোন যে আগুন নিভে গেছে।
- মশার কয়েল এমন স্থানে রাখুন যেখান থেকে অন্য কিছুতে আগুন লাগার কোনো ঝুঁকি থাকে না।
- গরম তরকারি ও ফুটন্ত পানি নাড়াচাড়ার সময় সতর্ক থাকুন। এগুলো অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।
- কেউ বিদ্যুতায়িত হলে তাকে খালি পায়ে, খালি হাতে জড়িয়ে ধরে ছাড়াবেন না। অবশ্যই শুকনো ও অধাতব কোনো কিছু দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনুন। সম্ভব হলে মেইন সুইচ বন্ধ করে তারপর তাকে ধরুন।
- গরম পানি পাতিলে করে নয়, বালতিতে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিন।
- ধূমপান শেষে বিড়ি-সিগারেটের বাদ দেয়া অংশের আগুন নিভিয়ে ফেলুন। মশারির ভেতর বা খাটে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করবেন না।

ফারদানা আলম সোমা
কার্যক্রম কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযান

মালয়েশিয়ায় শিক্ষা সফর

সবার জন্য শিক্ষা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেক টার্গেট পূরণেই বাংলাদেশের অগ্রগতি বেশ ভালো। বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্কুলে শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, প্রাথমিক শিক্ষার সমাপন পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে ধরে রাখা, মানসম্মত শিক্ষা অর্জন ইত্যাদি। সরকারি সূত্রানুযায়ী বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হলেও ঝরে পড়ার হার এখনো প্রায় ৫০%। এশিয়া মহাদেশের এমন অনেক দেশ আছে যারা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে সুদক্ষ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধায়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। নিকটবর্তী দেশের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি প্রতিনিধি দল ২৪ হতে ৩০ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত মালেয়শিয়ায় পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনে যায়। পরিদর্শন দলে সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য, কমিউনিটি ওয়াচ দলের প্রতিনিধি, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং অভিযানের কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল:

- মালয়েশিয়ার সরকার কিভাবে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ বিশেষ করে শিক্ষক সমিতি/ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা/সুশীল সমাজ কিভাবে সমন্বিতভাবে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন।
- গ্রাম ও শহর অঞ্চল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়সমূহের শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।
- সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ভিন্নতা এবং এর ব্যবস্থাপনাগত বিষয় অনুধাবন করা।
- মধ্য আয়ের দেশ এবং শিক্ষা প্রস্তুতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন প্রভৃতি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস পরিদর্শন এবং আলোচনা

প্রথম দিন সকালে পরিদর্শন দল পুত্রজায়ায় অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস পরিদর্শন করে এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উষ্ণ অভ্যর্থনার পর পরিদর্শন দলের জন্য মালয়েশিয়ার শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর একটি তথ্যমূলক উপস্থাপনা পেশ করা হয়। উপস্থাপনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে দলের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন কর্মকর্তারা।

এসময় পরিদর্শন দলের সদস্যরা বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন সফলতা এবং সমস্যা তুলে ধরেন। আলোচনায় জানা যায় মালয়েশিয়া সরকার শিক্ষা খাতের জন্য জাতীয় মোট বরাদ্দের ২৪% শিক্ষা খাতে ব্যয় করে। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রকে আরো উন্নত করার জন্য তাদের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। পরিশেষে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

এসকে সেরী মাকমুর বিদ্যালয় পরিদর্শন

দ্বিতীয় দিন পরিদর্শন দল কুয়ালালামপুর থেকে অনেক দূরবর্তী সেলাঙ্গর স্টেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি সরকারি বিদ্যালয়, এসকে সেরী মাকমুর পরিদর্শন করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২শ'। মাত্র ১২ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষকের এই বিদ্যালয়ে ৬০টি কম্পিউটার এবং অসংখ্য

ল্যাপটপ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ ছাড়াও পাঠ্যপুস্তক এবং স্কুল ড্রেসও ফ্রি পেয়ে থাকে। প্রতিটি শ্রেণী শিক্ষকের জন্য এখানে আলাদা অফিস কক্ষ রয়েছে। আর জুনিয়র শিক্ষকদের জন্য আলাদা বিশাল অফিস কক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর লাইব্রেরী রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের উপস্থিতি ওনলাইনে এন্ট্রি দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক বাসায় বসে জানতে পারে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এসেছে কিনা। ওনলাইনে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসও পরিচালিত হয় এই বিদ্যালয়ে। কো-কারিকুলাম কার্যক্রম অনেক সক্রিয় এই বিদ্যালয়ে। খেলাধুলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে এই বিদ্যালয়ে। পরিদর্শন দল বিদ্যালয়ে কোন ইনক্লুসিভ ক্লাস দেখতে না পেলেও বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ক্লাসের এবং শিক্ষকের ব্যবস্থা রয়েছে।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ দ্য টিচিং প্রফেশন (এনইউটিপি)-এর অফিস পরিদর্শন

২৭ জানুয়ারি বিকেলে পরিদর্শন দলটি কুয়ালালামপুরে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ দ্য টিচিং প্রফেশন (এনইউটিপি)-এর অফিস পরিদর্শন করেন। ১৯৫৪ সালে মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্স এবং ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্স ইন ন্যাশনাল স্কুল একত্রিত হয়ে ১৯৭৪ সালে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচিং প্রফেশন (এনইউটিপি) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এনইউটিপি-এর মূল উদ্দেশ্য হল

- এনইউটিপি-কে দক্ষ ও কার্যকর ইউনিয়ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- শিক্ষকদের জন্য মৌলিক অধিকারসহ এবং বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা;
- সদস্যদের সর্বোত্তম সেবা প্রদান এবং
- শিক্ষকতা পেশার উৎকর্ষ সাধন।

এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার। সদস্যদের প্রত্যেকে শিক্ষক। শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ এই সংগঠনের সদস্য হতে পারে না। সংগঠনটি শিক্ষকদের চাকুরি, বদলি, ছুটি, বেতন, পেনশন, চাকুরির বিভিন্ন সমস্যা, অতিরিক্ত কাজের চাপ, কল্যণসহ বিভিন্ন আইনী সহায়তা প্রদান করে থাকে। অনেকগুলো সফলতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এই সংগঠন নারী শিক্ষকদের স্থায়ী শিক্ষকের মর্যাদা প্রদানে সক্ষম হয়েছে যা আগে মালেয়শিয়াতে ছিল না, চিকিৎসা সুবিধা, হাউজিং এলাউন্স-এর সুবিধা এবং গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের দেশের অন্যান্য গ্রাজুয়েট প্রফেশনালদের সম মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় কোনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পরিদর্শন দলের শিক্ষক সংগঠন প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সংগঠনগুলোর ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে শেষে এনইউটিপি সদস্য বাংলাদেশের শিক্ষক সংগঠনগুলোকে একত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

এসএমকে সিফিল্ড বিদ্যালয় পরিদর্শন

২৮ জানুয়ারি ২০১৫ পরিদর্শন দলটি কুয়ালালামপুরের কাছেই এসএমকে সিফিল্ড পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরাই উপস্থাপনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু পরিচালনা করে, যা দেখে সবাই অভিভূত হয়। স্কুলের লাইব্রেরীতে রয়েছে ৩৫ হাজার বই। এছাড়াও প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের পাশে রয়েছে ছোট একটি করে লাইব্রেরি কক্ষ। মালয়েশিয়ার সরকারি বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষগুলোতে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণী কক্ষ হয়েছে অনেক আগেই হয়েছে। অন্যান্য সরকারি বিদ্যালয়ের মতই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা এবং বিনা ব্যয়ে শিক্ষা উপকরণসহ পোশাক পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে পিটিএ (পেরেন্টস-টিচার এসোসিয়েশন) অনেক শক্তিশালী এবং কার্যকর। তারা নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয়ের অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

'এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল' অফিস পরিদর্শন

২৮ জানুয়ারি বিকেলে দলটি এডুকেশন ইন্টারন্যাশনালের অফিস পরিদর্শন করেন। ইআই মূলত সারা বিশ্বব্যাপী কর্মরত শিক্ষক এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য

একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। এই সংগঠন মালেয়শিয়ায় গণসাক্ষরতা অভিযানের এই শিক্ষা সফরে আতিথ্য প্রদান করে।

মালয়েশিয়ায় এই অফিসটি একটি এক্সটেনশন অফিস যার মূল অফিস বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত। সংস্থাটির কার্যক্রমের ওপর একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। জানা যায় সংস্থাটি ব্যক্তিমালিকানা ও বাণিজ্যিকীকরণের বিপক্ষে মানসম্মত শিক্ষার জন্য কাজ করে থাকে। সরকারি কর্মকর্তারাও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে পারেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে ইআই কর্মকর্তারা বাংলাদেশে সিইসিএফ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে গণসাক্ষরতা অভিযানের নিকট থেকে জানতে পারেন।

সেখোলা জেনিস কেবাঙ্গসান বিদ্যালয় পরিদর্শন

সেখোলা জেনিস কেবাঙ্গসান বিদ্যালয়টি তামিল ভাষায় পরিচালিত একটি বিদ্যালয়। ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ পরিদর্শন দল মালেয়শিয়ার কেলাঙ্গ-এ অবস্থিত এই বিদ্যালয় পরিদর্শণ করেন। প্রায় ৬ একর এলাকার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিও মালেয়শিয়ার সরকারি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুটি শিফটে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২৪৫২ শিক্ষার্থীর জন্য ১১১ জন শিক্ষক রয়েছেন। শ্রেণীকক্ষ ৬৩টি, যেখানে ক্লাস হয় ৩২টি। সরকারি কারিকুলামে পড়ানো হলেও ভাষা ব্যবহার করা হয় তামিল। এটা বিশ্বের সর্ববৃহৎ তামিল ভাষায় পরিচালিত বিদ্যালয়। ১৩টি বিষয়-এর মধ্যে বিজ্ঞান ছাড়াও আইটি বিষয়ক আরো দুটি বিষয় পড়ানো হয় এখানে। একটি হল বিজ্ঞান/আইটি এবং অপরটি হল আইসিটি/ডিজাইনিং টেকনোলোজি। বিদ্যালয়টির বিশাল মাঠ, খেলা মাঠ, ক্লাসরুম পরিদর্শন দলের প্রতিটি সদস্যকে অভিভূত করে।

মালয়েশিয়ায় পরিচালিত 'সুরিয়ানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামক একটি এনজিও-র প্রতিনিধির সাথে সভা

২৮ জানুয়ারি বিকেলে পরিদর্শন দলটি মালয়েশিয়ায় পরিচালিত একটি এনজিও-র একজন প্রতিনিধির সঙ্গে একটি সভায় মিলিত হন হোটেল ফেডারেল ইন্টারন্যাশনালের একটি সম্মেলন কক্ষে। জেমস নায়াগান নামক এই ব্যক্তি মালয়েশিযায় সরকারের মানবাধিকার কমিশনার হিসেবে কাজ করেন। মূলত অভিবাসী জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি কাজ করেন। এই কাজের পাশাপাশি তিনি সুরিয়ানা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক একটি এনজিও-ও পরিচালনা করেন যেখানে রিফিউজি শিশুদের মূলত সহায়তা প্রদান করা হয়। তাদের খাবার, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়। সংস্থাটি জেলখানাতেও উদ্বাস্তুদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন।

রিফিউজিদের জন্য তারা ভোকেশনাল এবং হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট কিছু প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সমাপনী

২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ বিকেল ৫টায় হোটেল ফেডারেল-ইন্টারন্যাশনাল-এর সভা কক্ষে এক্সপোজার ভিজিটের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশনটি পরিচালনা করে জনাব এ্যালুশিয়াস ম্যথিউস, কো-অর্ডিনেটর, এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল। পরিদর্শন দলের সকলে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন।

এই পরিদর্শন দলে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন, অধ্যাপক মো. ইলিয়াস হোসেইন, পরিচালক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ব্রজ গোপাল ভৌমিক, সচিব, এনসিটিবি, কুমার প্রীতীশ বল, সম্বয়কারী, এফআইভিডিডবি, মোস্তফা কামাল মল্লিক, ঊর্ধ্বতন করসপন্ডেনস, চ্যানেল-আই, আসাদুজ্জামান সেলিম, নির্বাহী পরিচালক, মউক, মো. এমারত হোসেইন, সহকারী শিক্ষক, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মো. আব্দুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে তাসনীম আত্হার, পরিচালক, মো. এনামুল হক খান তাপস, ঊর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, সাকিবা খাতুন, ঊর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, ফারদানা আলম সোমা, কার্যক্রম কর্মকর্তা, মো. আব্দুল কুদ্দুস প্রিন্স, কার্যক্রম কর্মকর্তা, শামসুন নাহার বেগম, কার্যক্রম কর্মকর্তা, জয়া রানী সরকার, সহকারী কার্যক্রম কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ফারদানা আলম সোমা
কার্যক্রম কর্মকর্তা
গণসাক্ষরতা অভিযান

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই

সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১১-২০১৫) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা আছে, ২০১৫ সাল নাগাদ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে। একই সময়ে বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ ১৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা আছে ওই পরিকল্পনায়। কিন্তু পাঁচ বছর পর এসে বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতে গত পাঁচ বছর গড়ে জিডিপির ২.৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চলতি অর্থবছর শিক্ষা খাতে বাজেটের মাত্র সাড়ে ১১ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হতে হাতে সময় আছে আর মাত্র কয়েক মাস। কিন্তু পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের যে লক্ষ্যমাত্র ঠিক করা হয়েছে, সেটি অর্জিত হওয়ার সুযোগ নেই বলে স্বীকার করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা।

এদিকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী জুনে। জুলাই থেকে শুরু হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনায়ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ করেছে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী একটি দেশের শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬ শতাংশ এবং বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। যা ২০০০ সালে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সম্মতিতে স্বাক্ষরিত 'ডাকার ঘোষণায়ও' বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপি ও বাজেট দুই ক্ষেত্রেই অনেক কম। আফ্রিকাসহ পৃথিবীর অনেক দরিদ্র দেশ শিক্ষা খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে থাকা ড. শামসুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে যেসব লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল, তা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি, বিষয়টি সত্য। তবে আসছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক (২০১৬-২০) পরিকল্পনায় মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করা নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর চেয়ে বেশ পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপ তাদের মোট জিডিপির ৮.৭ শতাংশ, নেপাল ৪.৭ শতাংশ, ভুটান ৪ শতাংশ ও ভারত ৩.৪ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশ জিডিপির মাত্র আড়াই শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে শিক্ষা খাতে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ দেওয়া হয় তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়।

কালের কণ্ঠ ১৫.০১.২০১৫

১২ বছর পর বন্ধ থাকা স্কুল চালু

উপজেলায় ভাটি কাপাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ ১২ বছর বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছে। জানা গেছে, চরাঞ্চলের মানুষের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সেশিপ প্রকল্প এসইএসডিপির আওতায় আন্ডার সার্ভড ইউনিয়নে এক কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট বিদ্যালয়টি নির্মিত হয়।

নির্মাণের পর থেকে স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটি ও দাতা সদস্যদের সমন্বয়হীনতার কারণে দীর্ঘ ১২ বছরেও বিদ্যালয়টি চালু করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থা চলতে থাকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রাশেদুল হক প্রধান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহমুদুল হাসান মণ্ডল ও উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি শাহজাহান মিঞার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে একাডেমিক কার্যক্রম চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে। সে মোতাবেক বিদ্যালয়টি চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইত্তেফাক ২২.০১.২০১৫

নগরকান্দি সরকারি স্কুলে প্রধানশিক্ষক নেই ১৫ বছর

সিলেটের সীমান্তবর্তী জকিগঞ্জের নগরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। তাছাড়া শিক্ষক সংকটও চলছে। প্রায় দু'শ ছাত্র-ছাত্রীর এই স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক কোনরকমে পাঠদান করে চলছেন। তাও তিনি ডেপুটেশনে আছেন। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকসহ আরো ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ খুবই জরুরি।

২০০০ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। বর্তমানে সহকারী শিক্ষক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন।

এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হযরত আলী বলেন– পদোন্নতি হলে প্রধান শিক্ষক দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করবো। কিন্তু পনের বছর থেকে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কারণ জানতে চাইলে এ কর্তা কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ইত্তেফাক ২২.০১.২০১৫

শিক্ষকসহ ৩৩ হাজার জনবল নিয়োগ হচ্ছে

শিক্ষা খাতের অন্যতম বড় প্রকল্প 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' সংশোধনসহ পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয় কর্মসূচির আওতায় জাতীয়করণকৃত ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে ল্যাপটপ, সাউন্ড সিস্টেম মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকসহ সাড়ে ৩৩ হাজার 'অতিরিক্ত' জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এর আগে মূল প্রকল্পটি যখন পাস হয়, তখন মোট জনবল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৪৮ হাজার। এখন নতুন করে আরও ৩৩ হাজার জনবল নিয়োগ করা হবে। ফলে এ প্রকল্পে সর্বমোট ৮১ হাজার ৫৩২ জন জনবল নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক রয়েছেন।

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছিল ২০১১ সালে। তখন এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২২ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত প্রকল্পে এর ব্যয় কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ১৫৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে রংপুরে অবস্থিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ভোলায় একটি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন ও চুয়াডাঙ্গার একটি শিল্প নগরী গড়ে তোলা।

সমকাল ১৪.০১.২০১৫

ম্রো জাতি-গোষ্ঠীর বিলুপ্তপ্রায় 'রেংমিটচা' ভাষা পুনরুদ্ধার

বান্দরবানের ম্রো জাতি-গোষ্ঠীর বিলুপ্তপ্রায় রেংমিটচা' ভাষা পুনরুদ্ধার হয়েছে। এ ভাষাকে পুনর্জীবিতকরণের গবেষণাকর্ম চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডার্টমুথ কলেজের গ্রোগ্রাম ইন লেংগুয়েস্টিং অ্যান্ড কন্সনিটিভ সায়েন্স'র অধ্যাপক ডেভিড এ পিটারসন বাংলাদেশের বান্দরবানে গবেষণা চালিয়ে

ম্রো জাতি-গোষ্ঠীর বিলুপ্তপ্রায় 'রেংমিটচা' ভাষা পুনরুদ্ধার করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাইরা খান তাঁকে সহযোগিতা করেন।

ম্রো 'রেংমিটচা' ভাষার বর্ণমালা তৈরি, ম্রো জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে এ ভাষার প্রচলনের ধারণাপত্র তৈরি ও সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে আরও কয়েক বছর গবেষণাকর্ম চলমান থাকবে।

গতকাল রোববার সকালে বান্দরবান প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে ম্রো জাতি-গোষ্ঠীর 'রেংমিটচা' নামের ভাষা পুনরুদ্ধারকারী ও আন্তর্জাতিক ভাষা গবেষক অধ্যাপক ডেভিড এ পিটারসন ও তার গবেষণাকর্মের সহযোগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাইরা খান রেংমিটচা ভাষার কর্মশালায় উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে এসব তথ্য উপস্থাপন করেন।

ডেভিড এ পিটারসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের ডকুমেন্টিং এন্ডেনজার্ড লেঙ্গুয়েজেস প্রোগ্রাম –বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বান্দরবার ম্রো জনগোষ্ঠীর পুনরুদ্ধারকৃত রেংমিটচা ভাষা সংরক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আমাদের সময় ১২.০১.২০১৫

কারিগরি শিক্ষার্থীর হার ২০ শতাংশ করা হবে

শিক্ষা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবতার নিরিখে জীবনমুখী কারিগরি শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করতে কারিগরি শিক্ষাই মূল পথ। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর হার ২০ শতাংশ করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার তেজগাঁওয়ের টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের হলরুমে নবনির্মিত ওয়ার্কশপ কাম একাডেমিক ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বর্তমানে ওই শিক্ষার্থীর হার ২ শতাংশ বলে জানা গেছে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে আরও বক্তৃতা করেন শিক্ষাসচিব মো. নজরুল ইসলাম খান, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কাজুহিকো হিগুচি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর শাহজাহান মিঞা এবং সুইডিস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের ডেপুটি হেড অব কো-অপারেশন সিরোকো মেসেরলি প্রমুখ। ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের মন্তব্য উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের মতো দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষায় বাংলাদেশ এখন রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তিনি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টির আহ্বান জানান।

টিটিসিতে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে ছয়তলা ভিতের ওপর নবনির্মিত চারতলা ভবনটির আয়তন ২০ হাজার ৮০০ বর্গফুট। এ ভবনে দুটি সিভিল ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ৮টি ল্যাব, ৪টি লার্নিং রুম, একটি হলরুমসহ আনুষঙ্গিক কক্ষ রয়েছে। ভবনটি নির্মাণে এডিবি ও এসডিসি সহযোগিতা করেছে।

সমকাল ২২.০১.২০১৫

সেশন ফিস না দিলে মিলছে না নতুন বই!

উপজেলা তারাগঞ্জ ও/এ বালিকা স্কুল এন্ড কলেজে সেশন ফি'র টাকা ছাড়া সরকারিভাবে বিতরণ করা পাঠ্যপুস্তক না দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ কারণে অনেক শিক্ষার্থীই চলতি শিক্ষাবর্ষের বই পায়নি।

জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে ওই বিদ্যালয়ের চাহিদাপত্র অনুসারে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫৫৯ সেট পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সরেজমিনে বিদ্যালয়ে গিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে কথা বললে তারা জানায়, সেশন ফি'র ৬শ' থেকে ৬৮০ টাকা না দেয়ায় তারা নতুন বই পাচ্ছে না।

যারা এই টাকা পরিশোধ করেছে শুধু তাদেরকেই নতুন পাঠ্যপুস্তক দেয়া হয়েছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক জানান, নির্দিষ্ট ৫৬৫০ টাকা দিলেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই দেয়া হচ্ছে। অন্য আরেক অভিভাবক জানান, তার মেয়ে ৯ম শ্রেণির ছাত্রী। ৬৮০ টাকা না দেয়ায় তাকে বই দেয়া হয়নি। পরবর্তীতে ওই টাকা দেয়া হলে বই দেয়া হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লিপিকা দত্ত জানান, পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সেশন ফির টাকা আদায়ের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যপারে তারাগঞ্জ ও/এ বালিকা স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম জানান, প্রতিবছর ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সেশন ফি'র টাকা নেয়া হয়ে থাকে। এবারও সেশন ফি'র টাকা নেয়া হচ্ছে। তবে কোন অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে না।

ইত্তেফাক ২০.০১.২০১৫

মন্দিরভিত্তিক ও গণশিক্ষায় যুক্ত হচ্ছে পাঁচ লাখ শিশু

আরো প্রায় ৫ লাখ শিশু এবং ১৯ হাজার বয়স্ক মানুষ সাক্ষরজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে। এজন্য চতুর্থ দফায় সম্প্রসারিত হচ্ছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। এ অংশ বাস্তবায়নের ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৯ কোটি ৩১ লাখ ৬ হাজার টাকা।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় আজ মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে বলে পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পটি সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে। সেইসঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি জাতীয় শিক্ষানীতি ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ৪ লাখ ৯৫ হাজার শিশু প্রাক স্কুল শিক্ষার ও ১৮ হাজার ৭৫০ জন বয়স্ক মানুষ সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০২ সালে ১৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০২ সালের জুলাই থেকে ২০০৭ সালের জুন পর্যন্ত ২১টি জেলায় মান্দরভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন এবং শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২১টি জেলায় ২ হাজার ৫২০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ লাখ ৩ হাজার ৪৯০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে মোট ২৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৭ সালের জুলাই থেকে ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৩২টি জেলায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে ২ হাজার ৮০৪টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ লাখ ৪১ হাজার ৮৩০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৮ হাজার ৭৭৫ জন বয়স্ককে মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়।

পরবর্তী সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৭৭ কোটি ৬৯ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম তৃতীয় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ডিসেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩ লাখ ৬৮ হাজার ১৩০ জন শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৪ হাজার ৫২৫ জন বয়স্ককে মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

প্রকল্প মেয়াদে ৫ হাজার পাঁচশটি প্রাক-প্রাথমিক এবং ২৫০ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩ বছরে যথাক্রমে ৪ লাখ ৯৫ হাজার জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৮ হাজার ৭৫০ জন বয়স্ককে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক ২৩.০১.২০১৫

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশিক্ষণ

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ৩ থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ খুলানায় আয়োজিত হয় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের দুই দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ। বেসরকারি সংস্থা রূপান্তরের সহযোগিতায় খুলনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে খুলনা বিভাগের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ২২ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের সংবেদনশীল করা এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য এক সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করাই এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

দুইদিনের এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. ফারুক আহমেদ এবং রূপান্তরের নির্বাহী পরিচালক স্বপন গুহ। রিসোর্স পার্সন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন এসআরএইচআর বিশেষজ্ঞ

ডা. ইসমত আরা হেনা। এই প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের এসআরএইচআর পরিস্থিতি, স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রচলিত ধারণা, কুসংস্কার এবং পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারি এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সমাপনী সেশনে সুন্দরবন একাডেমীর পরিচালক আনোয়ারুল কাদির বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ সঞ্চালনায় সহযোগিতা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক রাজশ্রী গায়েন।

রাজশ্রী গায়েন

গণমাধ্যমকর্মীদের মাঠ পর্যায়ের এসআরএইচআর বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন

সাংবাদিকদের লেখনীর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীসহ সমাজের অন্যান্য অংশীজনদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য,

প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্ রাইটস্-এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় গণমাধ্যমকর্মীদের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) জন্য মাঠ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি এসআরএইচআর-এর কার্যক্রম পরিদর্শনের আয়োজন করে।

এর অংশ হিসেবে ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গণমাধ্যমকর্মীগণ সিলেট শহরে ব্র্যাক পরিচালিত শহরতলীর শিবের বাজারস্থ রাজারগাও উচ্চ বিদ্যালয় এবং হাসাব পরিচালিত এসআরএইচআর কার্যক্রম ও যুবমেলা পরিদর্শন করেন। এই কার্যক্রমে সিলেটের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের মোট ১২ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। তারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও যুবমেলায় আগত যুব ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

আব্দুল কুদ্দুছ প্রিন্স

আদিবাসীদের শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উপর আলোকপাত করা এবং তাদের সামগ্রিক উন্নয়নে করণীয় বিষয়াবলীর দিকে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্ব-উন্নয়ন সংস্থা যৌথ উদ্যোগে গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ রাজশাহীতে 'আদিবাসীদের শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এ সভায় রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং সুধী সমাজের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৪০ জনঅংশগ্রহণ করেন।

সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) এস. এম. তুহিনুল আলম, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. শরমীন ফেরদৌস চৌধুরী, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমীর উপপরিচালক এস.এম. শামীম আকতার, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পরিদর্শক আবুল হাসেম। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়নকর্মী ও গবেষক কুমার প্রীতীশ বল। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্ব-উন্নয়নের সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান খান। সভার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক রাজশ্রী গায়েন।

আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ সরকারিভাবে আদিবাসীদের পরিসংখ্যান নির্ধারণ, তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যেসব স্থানে স্কুল নেই সেখানে দ্রুত স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, কোটাভিত্তিতে আদিবাসীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া, তাদের মধ্যে সরকারি খাস জমি বিতরণ করা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেন।

রাজশ্রী গায়েন

পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সম্মেলন কক্ষে 'পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এনডিসি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিরিন আখতার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সিরাজুল হক খান। মূল আলোচনাপত্র উপস্থাপন করেন নৃবিজ্ঞানী ও গবেষক অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ।

সেমিনারে বক্তাগণ পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর/ আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির সঠিক প্রতিফলনের দাবি জানান। পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির যথাযথ চিত্রায়নের লক্ষ্যে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ রচনার কাজে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও তারা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

এ সেমিনারের প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এনডিসি বলেন, পাঠ্যপুস্তক যাতে সকল মানুষের সংস্কৃতি যথাযথভবে তুলে ধরা হয় এবং কোনো শ্রেণি বা সম্প্রদায় মানসিকভাবে যাতে আহত না হন সেদিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এনসিটিবি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়নে অব্যাহতভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের আহ্বান জানান।

সেমিনারের মূল আলোচনাপত্রের উপর আলোচনা করে আরো বক্তব্য রাখেন মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা, বাঁধন আরেং, বঙ্গপাল সরদার, আলবার্ট মানকিন, সুদত্ত চাকমা (উপ-সচিব), অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, অধ্যাপক শফি আহ্‌মেদ, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমানসহ আরো অনেকে।

এ সেমিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলের আদিবাসী প্রতিনিধি, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা, আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে নিবেদিত সংস্থার প্রতিনিধিসহ প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

আবু রেজা

গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ২০১৫-এর পরিকল্পনা সভা

গ্লোবাল অ্যাকশন উইক-২০১৫ উদযাপন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে একটি পরিকল্পনা সভা ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন এনজিও, সিভিল সোসাইটি গ্রুপ, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, শিক্ষক সমিতি এবং নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার মোট ৫৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট-এর প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। সভার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বর্ণনা করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আতহার। সভায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা দেশে গ্লোবাল অ্যাকশন উইক-২০১৫ উদযাপন বিষয়ে প্রস্তাবিত কর্ম-কৌশল এবং স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচির ওপর তাদের প্রস্তাবনা পেশ করেন। সভায় অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচির অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, এর নির্বাচন ও বাছাই প্রক্রিয়া, ক্যাম্পেইন-এর পদ্ধতি এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সম্ভাব্য কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া সভায় আসন্ন গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিসিই)-২০১৫ এর বোর্ড সভায় নির্বাচনের বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীকে আসন্ন জিসিই বোর্ড সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করেন। সভার শেষ পর্যায়ে অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কাজী আশিক এলাহী

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা বিষয়ক সভা

নতুনভাবে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রদত্ত মতামত/সুপারিশ কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ২৪ এবং ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক দলীয়ভাবে ১ম-৩য় এবং ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির সংশোধিত পাঠ্যপুস্তকে অভিযান প্রদত্ত মতামত কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তী কালে সংশোধিত পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের উপর পূণরায়

এনসিটিবি-কে মতামত প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর অনুষদের প্রাক্তন পরিচালক প্রফেসর ছিদ্দিকুর রহমান। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ, ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক শফিউল আলম, এনসিটিবির প্রাক্তন সদস্য মু. রিয়াজুল ইসলাম, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ মমতাজ জাহান, আইএইচডি-র অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, আইইআর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মু. নাজমুল হক, প্রফেসর ড. মো. আবুল এহসান এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ।

মির্জা মো. দেলোয়ার হোসেন

কাউন্সিল সভা

৩১ জানুয়ারি ২০১৫ গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সম্মেলন কক্ষে অভিযান-এর কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অভিযান কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। এছাড়া উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ হলেন: ড. মনজুর আহমদ, আরমা দত্ত, ম. হাবিবুর রহমান, জ্যোতি এফ গমেজ, শেখ এ. হালিম, সামসে আরা হাসান, ড. সেলিমা রহমান, শিশির এনজেলো রোজারিও, নাসির উদ্দিন আহমেদ, জাকী হাসান, গোলাম মোস্তফা দুলাল, কুমার প্রীতীশ বল, মাহবুবুল ইসলাম, রোকেয়া আফজাল রহমান, পারভীন মাহমুদ, মথুরা ত্রিপুরা এবং রাশেদা কে. চৌধূরী।

সভার আলোচ্যসূচি

১. বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী (সংযুক্ত) অনুমোদন ও ফলোআপ;

২. অভিযানের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩. অভিযানের চলমান প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ের কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন;

৪. অভিযানের নিম্নোক্ত পলিসিগুলোতে প্রস্তাবিত সংশোধনী বিবেচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন:

ক. Financial and Administrative Manual

খ. Human Resource Policy Manual

গ. Conflict of Interest Policy

৫. অভিযানের আগামী বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ;

৬. অভিযানের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মধ্যে যাদের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ও যারা শীঘ্রই অবসরে যাবেন এমন কর্মীদের বিষয়ে অবহিতকরণ;

৭. বিবিধ।

বিভিন্ন অলোচ্যসূচির ওপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় ও সর্বসম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। আগামী ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অভিযানের বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারিত হয়। সভায় কাউন্সিল সদস্যরা অভিযানের সদস্য সংগঠনগুলোর নির্বাহী প্রধানদের নিকট অনুরোধ জানান যে, অভিযানের বার্ষিক সাধারণ সভায় তারা যেন তাদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন না দিয়ে তারা নিজেরাই যেন অংশগ্রহণ করেন। এতে করে অভিযানের কার্যক্রম সম্পর্কে সদস্যসংগঠনগুলো পরিস্কার ধারণা লাভ করবেন এবং অভিযানের নিকট তাদের প্রত্যাশাগুলোও তুলে ধরতে পারবেন। এছাড়া সভায় নতুন সদস্যদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

জয়া সরকার

তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি রেডিও ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগ

সরকারি হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হলেও বিআইডিএস-এর একটি গবেষণা অনুযায়ী এখনও প্রায় এক-চতুর্থাংশ শিশু স্কুলের বাইরে রয়ে গেছে এবং ঝরে পড়া রোধ করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই মেয়ে শিক্ষার্থী। প্রাথমিক শিক্ষায় সমাপনীর হারও আশাব্যাঞ্জক নয়। এদের মধ্যে আবার প্রায় ২৫% মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির প্রথম দিকেই ঝরে যায়। প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা গেলে বিরাজমান পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত কমিউনিটি রেডিওগুলো এ ক্ষেত্রে জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃণমূল পর্যায়ে শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষাচক্র সম্পন্নকরণ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত ১৩টি কমিউনিটি রেডিও যৌথভাবে একটি ERC (Enrollment, Retention and Completion) ক্যাম্পেইন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১-৭ জানুয়ারি ২০১৫ সময়কালে নির্ধারিত প্রতিটি এলাকায় ERC ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিদিন ৩/৪ বার করে ক্যাম্পেইন/বার্তা/ম্যাগাজিন প্রচার করে। উপযুক্ত কার্যক্রমটি স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

মিজানুর রহমান আখন্দ

আগুনে পুড়ে গেলে তাৎক্ষণিক করণীয়

কি করা উচিত

- গায়ে আগুন লাগলে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি না করে-শুয়ে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিন অথবা অন্য কেউ আক্রান্ত হলে ভারী কাপড় দিয়ে সাবধানে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরুন এবং সান্ত্বনা দিন।
- পুড়ে যাওয়া ব্যক্তি সঠিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন কি না নিশ্চিত হোন। প্রয়োজনে মুখ গহ্বর ও নাকে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা পরিষ্কার করুন।
- পোড়া জায়গায়, পুড়ে যাওয়া কাপড় সরিয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পরিস্কার ও বিশুদ্ধ পানি ঢালুন ২০-৩০ মিনিট। বরফ অথবা ফ্রিজের পানি দিবেন না।
- বন্ধ জায়গায় যেমন যানবাহন, বন্ধ ঘর ইত্যাদি স্থানে আগুন লেগে গেলে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ স্থানে সরে আসুন অথবা আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত সরিয়ে নিন ও লম্বা লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিন বা নিতে বলুন।
- পুড়ে যাওয়া শরীরের অংশে পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিকটস্থ হাসপাতাল বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

কি করা উচিত নয়

- কোথাও আগুন লেগে গেলে বা কেউ পুড়ে গেলে আতঙ্কিত হবেন না।
- পুড়ে যাওয়া স্থানে অত্যধিক ঠাণ্ডা যেমন বরফ, ফ্রিজের পানি বা ঠাণ্ডা কোন কিছু দেয়া যাবে না।
- আক্রান্ত স্থানে কোন ধরনের টুথপেষ্ট, ডিম, গোবর, বাটা মশলা, হলুদ, দুধের সর বা অন্য কোন কিছু লাগাবেন না।
- আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা বা হাসপাতালের কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন এবং কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করুন।
- পোড়া রোগীর চিকিৎসা চলার সময় ভিড় করবেন না- কারণ এতে ক্ষতস্থানে সংক্রমণ হতে পারে।

বার্ন চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন

১. নিকটস্থ যে কোন সরকারি হাসপাতাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

২. নিকটস্থ যে কোন হাসপাতাল, যেখানে সার্জারী বিশেষজ্ঞ আছেন সেখানে যোগাযোগ করুন।

সূত্র স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪৮ মাঘ ১৪২১ জানুয়ারি ২০১৫

সম্পাদক

কালের অনিবার্য পরিক্রমায় আরো একটি বছর হারিয়ে গেল। মহাসমারোহে বিশ্ববাসী অভিবাদন জানালো ২০১৫-কে। বিবিধ কারণে প্রতি বছরেরই স্বতন্ত্র একটা ইতিহাসের সন্ধান হয়ত পাওয়া যায় না। তার কিছুটা হয়ত আনন্দপ্রদায়ী, কিছুটা হয়ত নানা বিভীষিকাময় স্মৃতিভারে ক্লিষ্ট, আবার অনেকটা রীতিমত আটপৌরে, অন্য সব বছরের মত। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন সত্য, তেমনই তা সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের চিত্রটাতে হরেকরকম পরিবর্তন হয়ত দেখা যায়। এসবের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ দেখতে পাওয়া যায় বর্ষশেষে। কিন্তু যাদের নুন আনতে পানতা ফুরোয়, তেমন গরিব মানুষদের অনেকের ক্ষেত্রেই হয়তো এমন নতুন পুরোনো বছরের পালাবদলের আলাদা কোন মানে থাকে না। তাদের রোজনামচায় শুধু দিনাতিপাতের সাধারণ হিসেব-নিকেশ। আমাদের মত বিকাশশীল অর্থনীতির দেশে এমন মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের জীবনমান কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, তেমন সব উপাদানকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার একটা উদ্যোগ প্রত্যেক বছরই দেখা যায়। হয়ত সেকথা ওইসব ভাষাহীন মানুষ জানেনও না। এই সূত্রেই কী পাওয়া গেল আর যায়নি তার আলোচনা গুরুত্ব পায় এবং একই সঙ্গে আগামী বছরের প্রত্যাশার রূপরেখারও একটা ধারণা পাওয়া যায়। এভাবে, না চাইলেও সাধারণ মানুষের একটা পরোক্ষ উপস্থিতি থেকেই যায়।

নানা রকমের অর্থনীতিশাস্ত্রসম্মত সামাজিক সূচকের বিশ্লেষণে বাংলাদেশ অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের এমন সাফল্যের কথা বার বারই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। এছাড়াও অনেক নামী-দামী ইউরোপীয় পত্র পত্রিকায়ও বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে বেশ প্রশংসার বাক্যরাজি প্রকাশিত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দারিদ্র্যের হার কমানোর যে ধরনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, বাংলাদেশের অর্জন তারও চেয়ে অনেকটা বেশি। এমন সব বিদেশী প্রত্যয়নপত্র আমাদের আশ্বস্ত করে, অনুপ্রেরণা যোগায়। একটা কথা প্রায়ই উচ্চারিত হয়, আমরা যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় আরও একটু মনোযোগী হতে পারতাম, দুর্নীতি কমাতে পারতাম, তা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন ও সামগ্রিকভাবে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে আমাদের দুর্ভাবনা হ্রাস পেত।

২০১৪ সালের সূচনাটা ছিল দেশবাসীর জন্য বেশ আতঙ্কের। একটা পরম অনিশ্চয়তার দোলাচল নিয়ে আমরা বছরটা শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বছরটা সাধারণ অর্থে জাতীয় বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছিল। সামাজিক অস্থিরতার একটা চাপ থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রবৃদ্ধির হারে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। এবং মনে রাখতে হবে, তা সম্ভবপর হয়েছিল দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত অবদানে। এবারের নতুন বছরের সূচনাটায় দেখতে পাচ্ছি কালো মেঘের গভীর ঘনঘটা ও বজ্রনির্ঘোষ। রাজনৈতিক ভিন্নমত বিভিন্নভাবে সহিংসতার জন্ম দিচ্ছে। যাঁরা দেশ পরিচালনা করেন, তারা যেন অন্য সবকিছুর উর্ধ্বে জাতীয় উন্নয়নকে স্থান দেন, এমন কামনাই আমরা করি এই নববর্ষে। যেন মনে রাখি, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সকল বিভেদ সরিয়ে কল্যাণের পথে অগ্রযাত্রায় সামিল হতে চায়।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org